২০ মার্চ ১৯৮৫ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

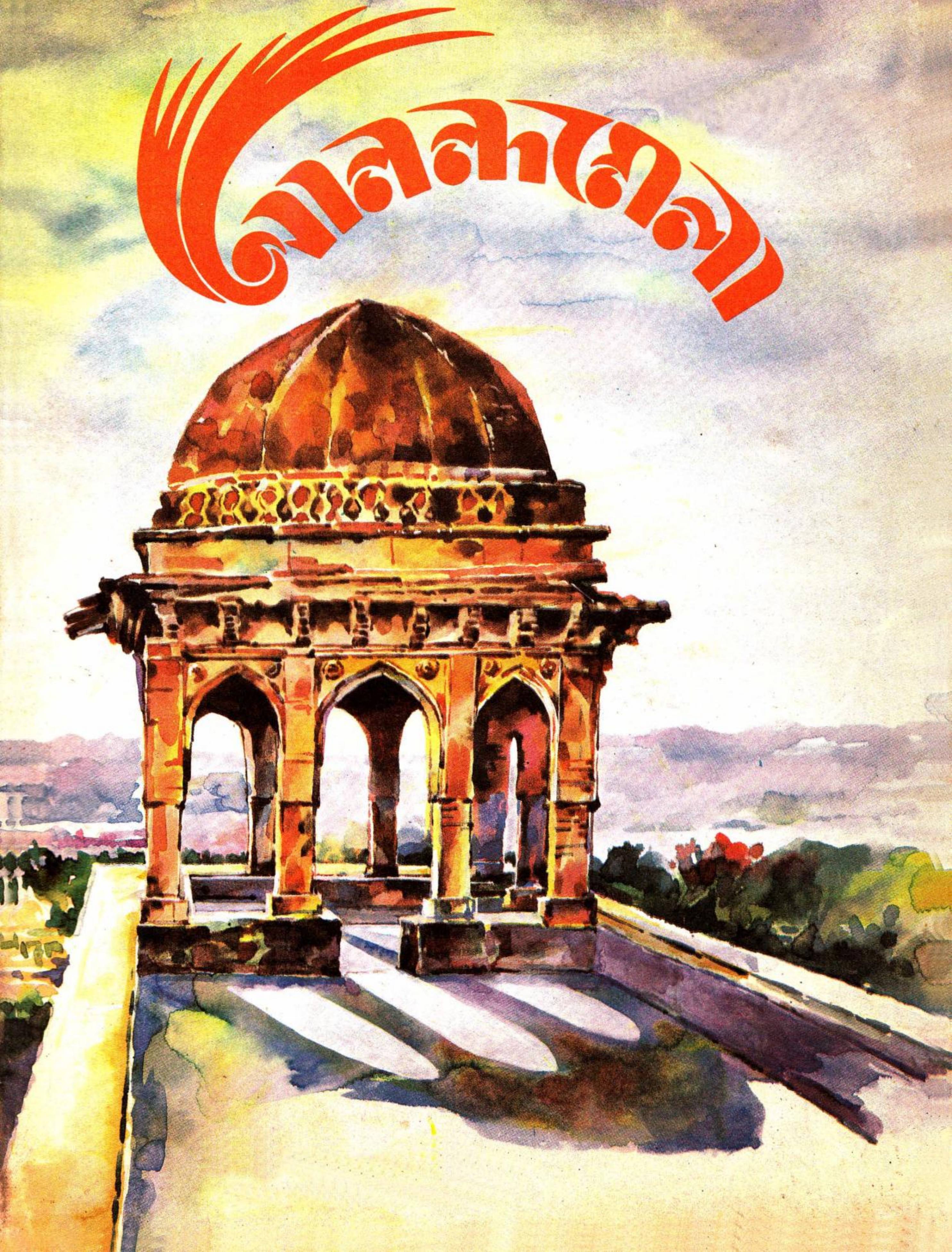

ফিরে ফিরে দেখে লোকে...
সুপার রিন-এর চমকটিকে !
सुपर
रिन
सफ़ेदी की चमकार
সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক...
অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী।
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আনন্দমেলা

৬ চৈত্র ১৩৯১ □ ২০ মার্চ ১৯৮৫ □ ১০ বর্ষ ১৯ সংখ্যা

সম্পূর্ণ ভ্রমণকাহিনী
মাণ্ডুর রূপমতী । বুদ্ধদেব গুহ ৩৪

বিশেষ রচনা
জলদস্যু ক্যাপ্টেন কিড । রবীন্দ্রনাথ ঘোষাল ২৭

ধারাবাহিক উপন্যাস
কালো পর্দার ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৭
গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২২

গল্প
শেষ রাতের সারথি । পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৫
ওরাওঁ ছেলে বুধন । প্রেমাংশু বশিষ্ঠ ১৩
নাম তার হারু । বিজনকুমার ঘোষ ৫৫

শার্লক হোমসের গল্প
নীলকান্তমণি রহস্য । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫১

অনুবাদ-গল্প
কবির ঘরে চোর । গোবিন্দ মিশ্র ৩২

বিজ্ঞানবিচিত্রা
লতায়-পাতায় (এলাম আমি কোথা থেকে)। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১১
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ১১

ছড়া ও কবিতা
আজব দেশে বাদল । অতীন্দ্র মজুমদার ৩১
ভালবাসে সব্বাই । সুভাষপ্রসন্ন ঘোষ ৩১
রাতবেরাতে । পিনাকীনন্দন চৌধুরী ৩৩
দেখল কে আর । প্রণব মুখোপাধ্যায় ৫৪
পাকুড়গাছির নাকুড়মামা। রবি ভট্টাচার্য ৫৪
স্বপ্ন । সুখেন্দু মজুমদার ৫৪

লেখাপড়া
দণ্ড ··· যোজন (অর্থ জানো) । দেব-সেনাপতি ১০
এক সন্ধ্যার ঘটনা (সহজে ইংরেজি) । প্রসাদ ১০
আড়িয়াদহ সর্বমঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয় । শ্যামলকান্তি দাশ ৪৬

খেলাধুলো
নিউজিল্যাণ্ডের নাটকীয় জয় । অশোক রায় ৬২
জাতীয় হকিতে সার্ভিসেস চ্যাম্পিয়ান । নৃপতি চৌধুরী ৬৩
দাপট দেখালেন বোলাররা । সুজয় সোম ৬৫
'একদিন'-এর রাজা । সম্রাট রায় ৬৬

চিত্রকাহিনী ও কমিকস
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২৪, সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬১

অন্যান্য আকর্ষণ
তোমাদের পাতা ৪৯, ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮
মজার খেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯

প্রচ্ছদ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

খুব ছোট ঘা'য়েও ধুলো লাগতে পারে
যার ফলে তা দূষিত হতে পারে, কষ্ট বেড়ে যেতে পারে

তাড়াতাড়ি,
ব্যাণ্ড-এড
দিয়ে জায়গাটা ঢেকে দিন

ব্যাণ্ড-এড
উত্তমভাবে সুরক্ষা প্রদান করে
ও দ্রুত উপশম করে

Johnson & Johnson

BAND-AID and JOHNSON & JOHNSON are trademarks of JOHNSON & JOHNSON USA

OBM/4670 BEN

ক্রীম ক্রাঞ্চ ফাঁস করছে
Bakeman's
Home Baked Freshness
Bakeman's
এক 'গোপন কাহিনী'
রসিয়ে রসিয়ে ক্রীম ক্রাঞ্চ বিস্কুট খাবার রহস্য ।
১ আশেপাশে কেউ নেই তো ? ভাল করে দেখে নিন
২ প্যাকেট থেকে সযত্নে একটা বিস্কুট বার করুন
৩ ধীরে ধীরে ওটাকে খুলে ফেলুন
৪ ভেতরের ক্রীমটুকু চাটতে থাকুন
৫ ক্রীমটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়া নং ৪ চালিয়ে যান
৬ মচ্‌মচে বিস্কুট গুলোয় এবার কামড় লাগান
৭ সাবধান ! ক্রীমে ভরপুর বিস্কুটের একটা টুকরোও যেন পড়ে না থাকে
Bakeman's Cream Crunch
BUTTER CREAM BISCUITS
Bakeman's Cream Crunch
ELAICHI CREAM BISCUITS
বাটার ক্রীম
ইলাচী ক্রীম
বেকম্যানের ক্রীম ক্রাঞ্চ
সত্যি – এর শেষ টুকরোটা পর্যন্ত শুধু ক্রীম, ক্রীম আর ক্রীম
কেবল বিশেষ কতগুলি সহরে পাওয়া যাচ্ছে ।
OBM/9665/1/Beng

গাড়ি চালিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দিল কে ?

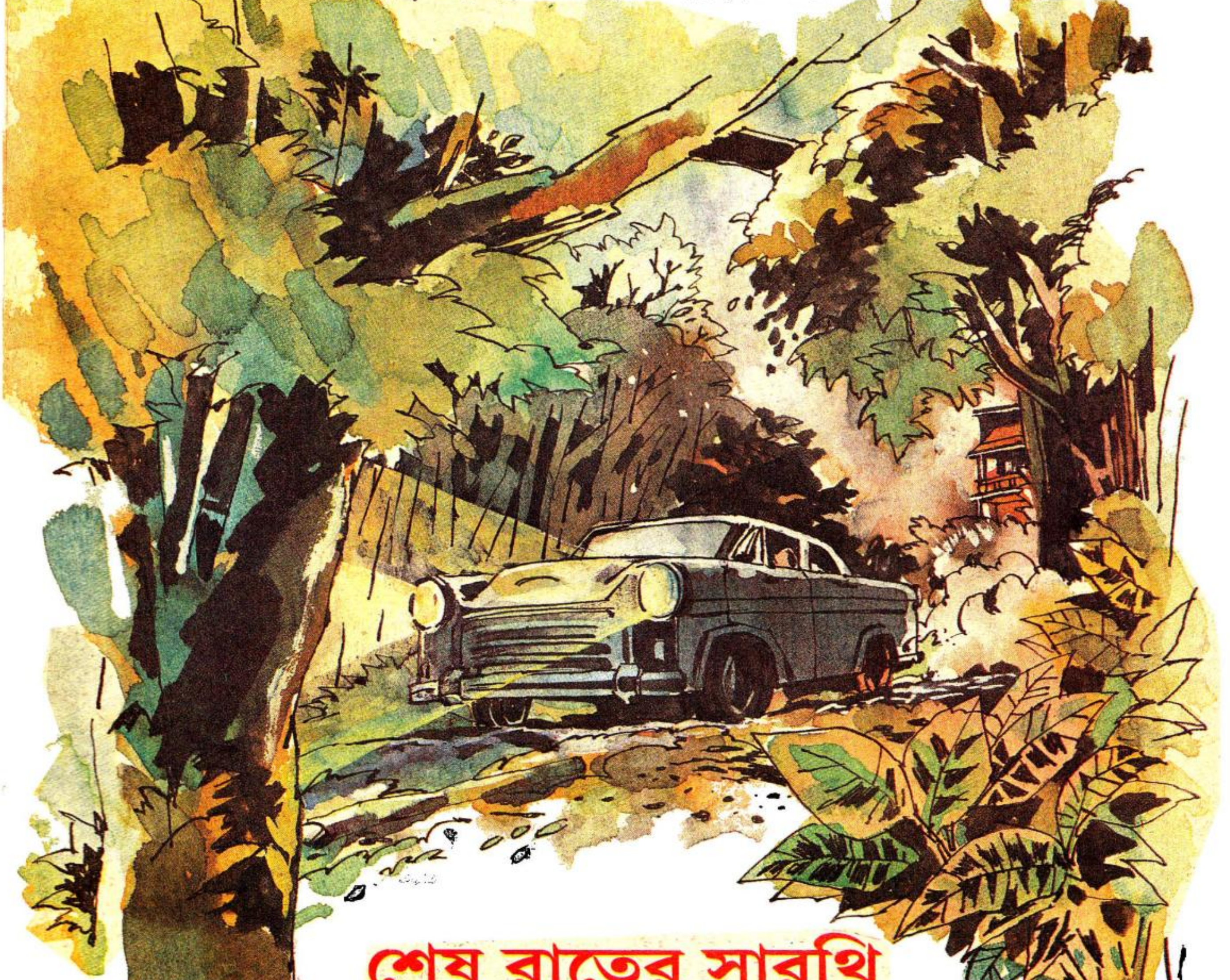

শেষ রাতের সারথি

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

মাজদিয়ায় গিয়েছিলাম এক সাহিত্যসভায় যোগ দিতে। কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে গেলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। ইনি একজন পদস্থ সরকারি অফিসার, তা ছাড়া লেখক হিসেবেও নামজাদা। আমি প্রথমে বানপুর লোকালে যাব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু মনোরঞ্জনবাবু বললেন "কৃষ্ণনগরে আমার কিছু সরকারি কাজ আছে। কাজেই আমি সরকারি গাড়িতে যাব। আপনি আমার সঙ্গে গাড়িতে চলুন, একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।"

মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে যদি সরকারি গাড়িতে না যেতাম আর যদি কৃষ্ণনগরের সেই বাংলোয় না থাকতাম, তা হলে এ গল্প আর লেখা হত না।

অথচ সেদিন রাতে আমার কিন্তু কৃষ্ণনগর সারকিট হাউসে থাকার কথা ছিল না। মাজদিয়ায় সাহিত্যসভার উদ্যোক্তারা বলেছিলেন, "রাতে আমাদের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়িতে আপনার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনার কোনও অসুবিধা হবে না। পরদিন ভোরের ট্রেনে আপনি চলে যাবেন।"

মনোরঞ্জনবাবু ঠিক সময় গাড়ি নিয়ে এলেন। অ্যামবাসাডর গাড়ি। আমাদের দুজনকে নিয়ে গাড়ি চলল এক্সপ্রেস হাইওয়ে অর্থাৎ ভি আই পি রোড হয়ে জাতীয় সড়ক ধরে। শীতকালের মিষ্টি রোদ্দুরে মসৃণ পথ ধরে চলতে বেশ ভালই লাগছিল। হরিণঘাটা পেরিয়ে রানাঘাটের ঝকঝকে প্যারিস হল গির্জা বাঁয়ে রেখে আমরা কৃষ্ণনগর যাবার বাইপাস রাস্তা ধরলাম। তারপর বেলা চারটে নাগাদ কৃষ্ণনগরের সেই বাংলোতে এসে পৌঁছলাম। প্রায় দশ বছর পর এলাম কৃষ্ণনগরে। বাংলোটার কোনও পরিবর্তন হয়নি। সামনের বিরাট ফাঁকা মাঠে কোনও বাড়িও ওঠেনি। বছর দশেক আগে একটা খবর করার জন্য এই বাংলোয় এসে ছিলাম দিন-তিনেক। সে-সময় এস পি ছিলেন জে পি সিং। সিংসাহেব আমাকে শিকারপুর বর্ডারে যাবার জন্য একটি

সরকারি গাড়ি দিয়েছিলেন। সেই গাড়ির ড্রাইভার ছিল রাজেন সরকার। পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বয়স তার। রোগা পাকানো চেহারা। অত্যন্ত ভদ্র। বিনয়ী। তিনদিন আমি তার সঙ্গে কাটিয়েছি। তার কথা এখনও মনে আছে। তিন কুলে কেউ ছিল না তার। বাংলোর সামনের ডানদিকের ঘরে যেখানে ভি আই পিদের ড্রাইভারেরা রাত্তিরবেলা শোয়, সেখানেই শুয়ে থাকত সে। দু'বেলা খেত হোটেলে। সেই স্মৃতি মনে পড়ল। রাজেন সরকারের কথা চৌকিদারকে একবার জিজ্ঞেস করব ভাবলাম, কথায়-কথায় ভুলে গেলাম।

মনোরঞ্জনবাবু বললেন, "আমি সভা সেরে আজ রাতে এখানেই থাকব। আর একটা ঘর খালি আছে, আপনিও থেকে যেতে পারেন। ওখানে কার বাড়িতে থাকবেন, আপনার অসুবিধে হবে।"

আমি বললাম, "আমিও আপনাকে বলব ভাবছিলাম। আমার কাল সকাল আটটার মধ্যে কলকাতা পৌঁছতে হবে। খুব জরুরি কাজ পড়ে গেছে।"

মনোরঞ্জনবাবু বললেন, "তাহলে আপনি আজ রাতে আমার সঙ্গে চলে আসুন। আমি কাল শেষ রাতে ড্রাইভার দিয়ে আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দেব।"

মাজদিয়াতে সভা সেরে রাত এগারোটা নাগাদ আমরা কৃষ্ণনগর পৌঁছলাম। সভার লোকজন অনুরোধ করেছিলেন রাতটা ওখানে কাটাতে। তারপর একজন ভয় দেখাবার জন্য মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লেন, "এত রাতে যাবেন, পথটা খারাপ। একে তো ডাকাতে-কালীর মাঠ পড়বে পথে। ওই পথে প্রায়ই ডাকাতি হয়। তা ছাড়া এই তো সেদিন এই পথেই রাত্তিরবেলা একজন সরকারি অফিসার ও ড্রাইভার অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলেন। কাগজে দেখেছেন বোধহয়।"

আমি বললাম, "প্রত্যেক পথেই দুর্ঘটনা হয়। তা হলে তো কোনও পথেই চলা উচিত নয়। আমার পক্ষে কৃষ্ণনগর থাকাটাই সুবিধে। আপনারা দয়া করে আর অনুরোধ করবেন না।"

না, পথটা নির্বিঘ্নেই চলে এলাম। উপরন্তু ফেরার সময় গাড়িতে সঙ্গী হয়েছিলেন সুধীন্দ্রবাবু। কৃষ্ণনগরের ডাকসাইটে সাংবাদিক। শুধু ডাকাতে-কালীর মাঠটা পেরিয়ে যাবার সময় বলেছিলেন, 'দুর্গা, দুর্গা।'

আমাদের ড্রাইভারের নাম পরেশবাবু। মনোরঞ্জনবাবু পরেশবাবুকে বললেন, "ওঁকে রাত সাড়ে চারটের সময় স্টেশনে পৌঁছে দিতে হবে।"

পরেশবাবু বললেন, "আমাকে ডাকবেন। আমি এখানেই ঘুমোব।"

মনোরঞ্জনবাবু বললেন, "আপনার কোনও অসুবিধে হলে আমাকেও ডাকতে পারেন। আমি পাশের ঘরেই আছি।"

শীতের রাত। জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণনগরে কলকাতার চেয়ে চার ডবল ঠাণ্ডা। নতুন জায়গায় চট করে ঘুম আসতে চায় না। সুন্দর রাবার-ফোমের গদি, নাইলনের মশারি। তবু ঘুম এল না। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে হঠাৎ আমার রাজেন সরকারের কথা মনে পড়ে গেল। আরে, রাজেন সরকার এখানে এখনও আছে কি না, তা তো জেনে নেওয়া হল না। মনে আছে, সেবার যাবার সময় রাজেনকে আমি কুড়ি টাকা বখশিস দিয়েছিলাম। রাজেন বলেছিল, "সার্, এত বছর ধরে কত সাহেবের গাড়ি চালাচ্ছি, কুড়ি টাকা আমাকে কেউ বখশিস দেয়নি।"

"সংসারে তোমার কে আছে রাজেন?"

"মা-বাবা কেউ নেই সার্। আমি বিয়ে-থা করিনি। এক বিধবা বোন আছে, কাশীতে থাকে। ভাগ্নেটা মানুষ হয়নি। মাকে দেখে না। বোনকে নিয়মিত টাকা পাঠাই।"

যাবার সময় বলেছিল, "আপনি আবার এলে দেখা হবে সার্। আমার তো বদলির চাকরি না। এখানেই থাকব।"

আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে কোথা থেকে রাতটা কেটে গেল। ঢং ঢং করে ঘড়িতে চারটে বাজতেই আমি লাফিয়ে উঠলুম। ইশ, আর একটু আগে ওঠা উচিত ছিল। তাড়াতাড়ি মুখে-চোখে জল দিয়ে রেডি হয়ে নিলাম। তারপর ড্রাইভারের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলাম, "পরেশবাবু, পরেশবাবু।"

কোনও সাড়াশব্দ নেই। ঘরে গিয়ে দেখি, পরেশবাবু নেই। বিছানা খালি। শীতকালের রাত চারটে মানে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার।

দু' একবার ডাকলাম, "পরেশবাবু, পরেশবাবু!" কোনও সাড়া নেই। কোথায় গেল লোকটা। না, গাড়িতেও নেই। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাংলোর সামনেই।

হঠাৎ দেখি চাদর মুড়ি দিয়ে কে একজন সামনের মাঠ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম বোধহয় পরেশবাবু। দু' একবার ডাকতেই লোকটি আমার দিকে এগিয়ে এল।

লোকটি আমার থেকে হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে। মুখটা চাদরে ঢাকা। পরনে খাকির প্যান্ট। আমাকে বলল, "আমাকে চিনতে পারছেন? আমি রাজেন।" আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। রাজেন! মুখের চাদর কিন্তু রাজেন সরায়নি, শুধু ওর চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমি বললাম, "আরে, রাজেন। আমি তোমার কথা সারারাত ভেবেছি।"

"তাই তো আমি এলাম সার্।"

"মানে? তুমি এখানে এখন থাকো না?"

"হ্যাঁ, মানে, হ্যাঁ এখানেই তো থাকি।"

"কাল কোথায় ছিলে?"

"ডিউটি থাকে তো। কাল রাতে আপনি যখন মাজদিয়া থেকে ফিরছিলেন, আমি জানি।"

"তুমি কী করে জানলে?"

"সে বলব না। তবে কাজটা ভাল করেননি সার্। রাত দশটার পর রাস্তাটা খারাপ। একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। আপনারও লাগতে পারত।"

"ও, তুমি কিছুদিন আগেকার অ্যাকসিডেন্টের কথা বলছ। দ্যাখো, অ্যাকসিডেন্ট হয় নিজের দোষে। সাবধানে চালালে ..."

"মিথ্যে কথা!" রাজেন চিৎকার করে উঠল। তার হঠাৎ চিৎকার শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তারপর রাজেন নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, "কিছু মনে করবেন না সার্। তবে জেনে রাখুন, সেদিন যে ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল, সে সাবধানেই চালাচ্ছিল। আপনি কি ড্রাইভারকে চিনতেন সার?"

"না। আমি এখানে এসে শুনলাম।"

"আপনি এখন স্টেশনে যাবেন তো?"

"হ্যাঁ, তুমি কী করে জানলে ? পরেশবাবু কোথায় ?"

"বোধহয় উঠে কোথাও গিয়েছেন। আমাকে বলে গেছেন আপনার কথা। চলুন, আপনাকে স্টেশানে পৌঁছে দিই।"

"তোমার কাছে চাবি আছে ?"

"আপনি কিছু ভাববেন না। উঠুন গাড়িতে।"

আমি গাড়িতে উঠলাম। রাজেন গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। নির্জন রাস্তা দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলল গাড়ি। এক-এক সময় ড্রাইভারের আসনে বসা রাজেনকে দেখা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন চালকশূন্য অবস্থায় পাগলের মতো গাড়িটা ছুটে চলেছে।

আমি চিৎকার করে উঠলাম, "রাজেন, রাজেন, এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছ কেন ? রাজেন !"

রাজেন হো হো করে হেসে উঠল। "ভয় পাবেন না সার্। আপনার কোনও ভয় নেই। আমি আছি।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্টেশন এসে পড়ল।

গাড়ি থেকে নামার সময় রাজেন আমাকে বলল, "সার্, শুনুন।"

আমি ফিরে তাকালাম।

রাজেন বলল, "আমার বোন যে কাশীতে থাকে তার কথা আপনাকে বলেছিলাম সার্। সে এখন কলকাতায় থাকে। তার ঠিকানা ৪৩নং বিজন সরকার লেন, শ্যামবাজার। তাকে একটা খবর দিতে পারবেন দয়া করে ?"

"কী খবর ?"

রাজেন একটা কাগজের খাম হাতে দিয়ে বলল, "বলবেন, কেষ্টনগরের ব্যাঙ্কে আমার নামে দশ হাজার টাকা আছে ফিক্সড ডিপোজিটে। টাকাটা যেন আমার ভাগনে ভূতোর হাতে গিয়ে না পড়ে। বিজলী, মানে আমার বোন, যেন তুলে নেয়। তাকেই নমিনি করা আছে।"

চাদরের ভেতর থেকে একটা হাত বেরিয়ে এল আমার দিকে। তাতে ধরা খামটি।

আমি বেশ অবাক হয়ে খামটি নিলাম।

ট্রেনের আর দেরি নেই। টিকিট কাটবার জন্য আমি চলে গেলাম। যাবার সময় কী একটা কথা বলার জন্য ফিরে তাকিয়ে দেখি, রাজেন নেই। শুধু গাড়িটা দাঁড়িয়ে। এই মাত্র তো সে গাড়ির ভেতর বসে ছিল। কোথায় গেল সে ? কিন্তু আমার ট্রেনের সময় হয়ে গেছে।

কলকাতায় বাড়িতে পা দিতে না দিতেই ট্রাঙ্ককল এল কৃষ্ণনগর থেকে। মনোরঞ্জনবাবু ফোন করেছেন। "কখন ফিরলেন ? অদ্ভুত কাণ্ড মশাই।"

"কেন, কী হয়েছে ?"

"আপনাকে গাড়ি চালিয়ে স্টেশনে নিয়ে গেল কে ? পরেশবাবু শেষ রাতে উঠে মাঠের দিকে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন গাড়ি নেই। আপনিও নেই ! তাজ্জব ব্যাপার ! তারপর সকাল আটটার সময় গাড়িটাকে পাওয়া গেল পরিত্যক্ত অবস্থায় কৃষ্ণনগর রেল-স্টেশনে।"

"কেন, রাজেন গাড়ি ফেরত নিয়ে যায়নি ?"

"কে রাজেন ?"

"সরকারি ড্রাইভার। আমার সঙ্গে দশ বছর আগে একবার পরিচয় হয়েছিল। সেই তো বলল, পরেশবাবু নাকি তাকে বলেছে আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে।"

"কী নাম বললেন ?"

"রাজেন সরকার। ওখানেই থাকে।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমি চৌকিদারকে ডাকছি।" একটু পরে মনোরঞ্জনবাবু বললেন, "কী বলছেন যা-তা, রাজেন সরকার তো গত রবিবার দিন অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। রাত দশটার সময় ডাকাতে-কালীর মাঠের কাছে আমগাছে ধাক্কা লেগে ···ও মশাই, শুনছেন ? হ্যালো ···হ্যালো ···"

আমার মুখ দিয়ে কথা সরছে না। হাত থেকে রিসিভারটা খসে পড়েছে। কোটের পকেটে হাত দিয়ে দেখি, হ্যাঁ, একটা খাম রয়েছে বটে। খামের ভেতরে ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিটের রসিদ ! রাজেন্দ্রনাথ সরকার। তিন বছর আগে দশ হাজার টাকা জমা পড়েছে ওই অ্যাকাউন্টে।

খামটা চেপে ধরে আমি চেয়ারে বসে পড়লাম।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

LINTAS.LR.42-2739 BG

নতুন লিরিল
তরতাজা করা এক নতুন অনুভব !
লিরিল অনন্য নতুন রূপে !
মন কেড়ে নেওয়া
এক অপরূপ নতুন সুরভিতে...
আকর্ষণীয় নতুন প্যাকে ।
NEW
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
নতুন
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান
আপনাকে পরিণত করে লাবণ্যে
ঢলঢল নারীতে !
হিন্দুস্থান লিভার-এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন ।

অর্থ জানো

দণ্ড…যোজন…

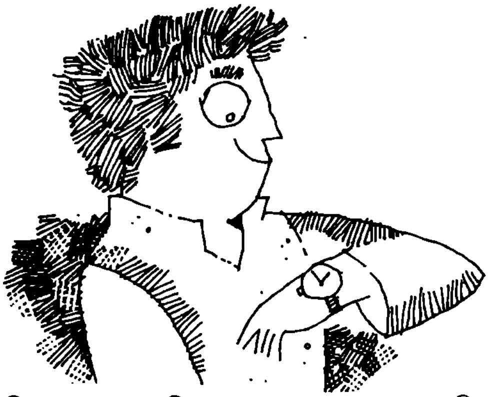

"বঁদির কেল্লা চিতোর হতে যোজন তিনেক দূর"—রবীন্দ্রনাথের "পণরক্ষা" কবিতায় আমরা সবাই পড়েছি, আর যোজন শব্দের একটা অর্থ আন্দাজ করে নিয়েছি তখনকার মতো। কিন্তু দেখা যায়, জীবন শেষ হয়ে যায় তবু পরিচিত শব্দের অর্থ জানা হয়ে ওঠে না। নীচের শব্দগুলি আমাদের খুবই পরিচিত এবং সাহিত্যে ও কথায় যথেষ্ট ব্যবহৃত। প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে ঠিক অর্থ জানবে।

১। **দণ্ড**—(ক) এক ঘণ্টা। (খ) ২৪ মিনিট। (গ) এক বেলা। (ঘ) দেড় ঘণ্টা।

২। **ক্রোশ**—(ক) এক মাইল। (খ) আধ মাইল। (গ) দুই মাইলের একটু বেশি। (ঘ) একশো গজ।

৩। **প্রহর**—(ক) এক ঘণ্টা। (খ) এক বেলা। (গ) কিছুক্ষণ। (ঘ) তিন ঘণ্টা।

৪। **যাম**—(ক) বারো ঘণ্টা। (খ) মধ্যরাত্রি। (গ) তিন ঘণ্টা। (ঘ) পুরো এক রাত্রি।

৫। **যোজন পথ**—(ক) দুই মাইল। (খ) আট মাইল। (গ) আধ মাইল। (ঘ) চার মাইল।

উত্তর : ১। দণ্ড (খ) ২৪ মিনিট। যেমন 'এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ' (রবীন্দ্রনাথ)।

২। **ক্রোশ**—(গ) দুই মাইলের একটু বেশি। যেমন 'বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে/বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে/ দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা/ দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু' (রবীন্দ্রনাথ)

৩। **প্রহর**—(ঘ) তিন ঘণ্টা। যেমন 'বেলা প্রায় এক প্রহর হইল' (বঙ্কিমচন্দ্র)।

৪। **যাম**—(গ) তিন ঘণ্টা। যেমন—'সেই রাত্রিতে মধ্যযাম ঘোষিত হইবার পর সোমদত্তা আবার আসিল' (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)।

৫। **যোজন পথ**—(খ) আট মাইল বা চার ক্রোশ। যোজন তিনেক দূর অর্থ হবে ২৪ মাইল।

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

এক সন্ধ্যার ঘটনা

মিলির আজকাল মাঝে-মাঝে মনে পড়ে যায়, সে আর আগেকার মতো ছোট নেই, সে এখন বড় মেয়ে, প্রায় মহিলা বললেই চলে। গত পুজোর সময়ে কোন্ প্যাণ্ডেলের কোন্ ভলান্টিয়ার নাকি শাড়ি-পরা মিলিকে 'আপনি' বলেছিল। চম্বল বলে, তার পর থেকেই নাকি মিলির হাব-ভাব একটু অন্য রকম। সে-বিষয়ে আমরা ঠিক করে কিছু বলতে পারব না, তবে একটা জিনিস লক্ষ করছি, আমাদের শ্রীমতী চামেলি রায়কে কেউ গান গাইতে বললে আজকাল আর তিনি চট করে রাজি হন না।

One evening last week an old friend of Mr. Roy came. He had come from Africa where he had settled down a long time ago. It is only on rare occasions that he is able to visit India. Naturally, Mr. Roy was very pleased to see him. Mr. Nandi, his friend, beamed with pleasure.

As soon as he learnt that Milly was receiving lessons in music, he cried out with delight, "I'm in luck, then! What will you sing, my dear? Let's have a few songs of Rabindranath, shall we?"

Mr. Roy said, "It's Rabindranath's songs she's learning. Come Milly, don't keep your uncle waiting."

"Please, Mummy," Milly said, "not today. My voice is in an awfully bad condition."

"There doesn't seem to be anything wrong with it. Come, don't make excuses. We're waiting."

Milly still seemed reluctant.

Then Mr. Roy said, "One doesn't like to keep people waiting, does one?"

It was only then that Milly started singing. But as soon as she had sung a line or two she stopped.

"I don't remember that one," she said. "I'll sing another."

She started again, and again stopped in the middle. Then she said, "Mummy, may I go and get the book? I forget some of the words."

Mrs. Roy was very annoyed, and Mr. Roy looked very grave.

সে-দিন রাতে খাবার টেবিলে বাবা মিলিকে গম্ভীর হয়ে কয়েকটি কথা বললেন।

"Look, Milly," he said, "I must say you behaved very badly this evening. There was nothing wrong with your voice. It's quite some time since you started taking lessons in singing. One has every right to expect you to be able to sing. Secondly, it was an old friend of mine who requested you to sing. One doesn't say 'no' to such a request if one can help it. Then again, he was our guest for the evening. One does one's best to entertain a guest. I hope you'll remember this in the future."

এবারে এই কথাটির ব্যবহার লক্ষ করো :

ONE

সাধারণভাবে লোকের কথা বলতে কথাটি ব্যবহার করা হয়।

One doesn't want to keep people waiting.
One has every right to expect you to be able to sing.
One doesn't say 'no' to such a request.
One does one's best to entertain a guest.

প্রসাদ

লতায়-পাতায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দূরসম্পর্কের আত্মীয় হলে আমরা বলি, ওর সঙ্গে আমার হল গিয়ে লতায়-পাতায় সম্পর্ক। বংশলতা, বংশপত্রিকা, এইরকম আরও কথা আছে। সম্পর্ক বোঝাতে গাছের উপমাটা কেমন লাগসই হয় দ্যাখো। ঝুম্পুকে বললাম, রুনু তোমার কে হয়? ও কিছু না বলে খস্‌খস্ করে ছবি এঁকে আমার হাতে দিল। তাকিয়ে দেখি একটা গাছ।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, ঝুম্পু আর ঝড়ু দুই ভাই। ওদের ফ্যাকরা দুটো ওদের বাবার ডালে এসে পড়েছে। তেমনি রুনু আর রাজু দুই ভাই। ওদের বাবার ডাল থেকে ওদের ফ্যাক্‌রা দুটো বেরিয়েছে। তারপর ঐ ডালদুটো যে কাণ্ডে এসে মিশেছে, সেইখানে ওদের ঠাকুর্দার ঠাঁই মিলছে। প্রথম ডাল বেরিয়েছে রুনুর বাবার। কাজেই উনি হলেন

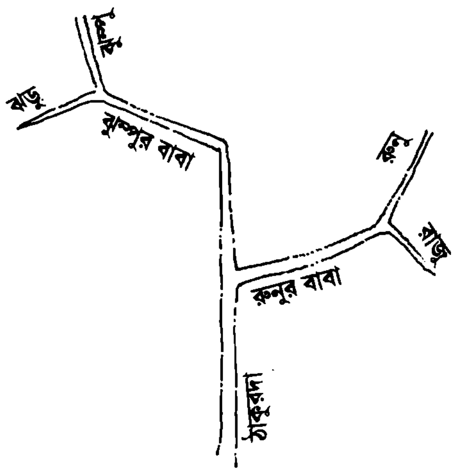

ঝুম্পুর জ্যাঠামশাই। ঝুম্পুর জ্যাঠতুতো দাদা হল রুনু। কাজেই ওদের মূল পূর্বপুরুষ হলেন ঠাকুর্দা।

এইভাবেই বৈজ্ঞানিকেরা এক উদ্ভিদের সঙ্গে অন্য উদ্ভিদের, এক প্রাণীর সঙ্গে অন্য প্রাণীর আত্মীয়তার সূত্র দেখিয়ে থাকেন।

পৃথিবীতে আছে লক্ষ লক্ষ রকমের উদ্ভিদ আর প্রাণী। তাদের একের সঙ্গে অন্যের আছে এমনি লতায়-পাতায় সম্বন্ধ।

মানুষের সঙ্গে শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণীদের কত কাছাকাছি আত্মীয়তার সম্পর্ক, একটা ছবি আঁকলে সহজেই তা ধরা যায়।

গোরিলা আর মানুষের ডাল এসে মিশেছে এপ্ বা বনমানুষের জায়গায়। তার মানে, মানুষের পূর্বপুরুষ হল এই এপ্ বা বনমানুষ (পুচ্ছহীন বানর)।

ছবিটা দেখলেই বোঝা যাবে, মানুষ বা গোরিলা, এরা কেউ কারও পূর্বপুরুষ নয়। বরং এদের উভয়েরই পূর্বপুরুষ হল এপ্। বা এক ধরনের বনমানুষ। এরা তিন-চার কোটি বছর আগে পৃথিবীতে বাস করত। ইউরোপ, আফ্রিকা আর এশিয়ায় এদের অস্থি-কঙ্কাল পাওয়া গেছে।

বানরের চেয়ে এপ্ বা বনমানুষ যেমন মানুষের নিকটতর আত্মীয়, তেমনি, মাছের সঙ্গে বানরের সম্পর্কের চেয়ে পাখির সঙ্গে সরীসৃপের সম্পর্ক ঢের নিকটতর। ছবির দিকে তাকালেই তা বোঝা যাবে।

(ক্রমশ)

জেনে নাও

নৌকো জলে ভাসে কেন

একটা কাঠের নৌকো তো খুব হালকা নয়। তাতে কত লোক ওঠে, কত মাল যায়। তবু নৌকো তার স্বাভাবিক অবস্থায় জলে না ডুবে ভাসে কেমন করে?

জলে কোনো কিছুর ভাসা বা ডোবা, শুধু সে কতটা ভারী বা তার ওজন কত, তার উপরে নির্ভর করে না।

আমাকে যদি কেউ সামনের দিক থেকে ধাক্কা দেয় পেছন দিকে, আর সেই সঙ্গে কেউ যদি পেছন থেকে ঠেলা দেয় সামনে, তাহলে আমি কোন্‌দিকে যাব? দুটো উলটোমুখো ধাক্কা একই সঙ্গে কাজ করছে। যার জোর বেশি, জেতার কথা তারই।

জলে নৌকো ভাসা-ডোবার বেলাতেও এ-রকম দুটো ধাক্কা কাজ করছে। একটা ধাক্কা বলা যায় লোকজনসমেত নৌকোর নিজের ওজন, যেটা তাকে নীচের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এটা একটা বল। এই বলটাই নৌকো ডোবানোর কারণ।

আর একটা ধাক্কা নৌকোটাকে উপর দিকে ঠেলে তুলে রাখতে চায়। এটাও একটা বল। নৌকোকে ভাসিয়ে রাখায় এই বলটার দরকার সবচেয়ে বেশি।

কিন্তু উপর দিকে ঠেলে তুলে রাখার জোরটা আসছে কোথা থেকে?

জলের উপরে ভাসমান নৌকো অনেকটা জল সরাচ্ছে। এই সরানো জলের একটা ওজন আছে। সেই ওজনই নৌকোটাকে উপর দিকে ঠেলে তুলে রাখার চেষ্টা করছে।

কাঠের নৌকো—তার এমন গড়ন যে সবসুদ্ধ তার যা ওজন, সরানো জলের ওজন তার চেয়ে বেশি। আর যার জোর বেশি, সে তো জিতবেই।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

অনুভূতি এমন, যা সঙ্গ দেয় সারাজীবন

মধুর মমতাভরা যত্নের ছোঁয়া জন্ম থেকেই পেয়ে এসেছেন যার ··· সেই, জনসন্স বেবী পাউডার – কোমল যেন মমতার পরশ ··· বিশুদ্ধ আর মৃদু ! এর স্নেহধারা বরষিত হয় আপনার ওপরে, দিনের পর দিন ধরে ! তাইতো, শিশুকাল হয়ে গেলেও পার··· জনসন্স বেবী পাউডারের সঙ্গে সম্বন্ধ, সারাজীবন অটুট থেকে যায় আপনার !

কোমল যেন মমতার পরশ জনসন্স বেবী পাউডার

LINTAS J&J 23 2619 BG

“টাটানগরে চলে যাব। সিংজি খুঁজে পাবে না।”

ওরাওঁ ছেলে বুধন

প্রেমাংশু বশিষ্ঠ

শরতের রোদ্দুরে চুটিয়া গ্রামের মাটির কুঁড়েঘর আর মেঠোপথ ঝলমল করছে। রাঁচি জেলার এই ছোট্ট অখ্যাত গ্রামে প্রকৃতি তার অফুরন্ত সৌন্দর্য যেন উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। উঁচু-নিচু পাহাড়ি জমির মধ্যে সবুজ ঘাস। দূরে সারি-সারি পাহাড়।

প্রতিদিনের মতো আজও পুবের আকাশ লাল করে সূর্য উঠেছিল আর কঁ কঁ করে ডেকে উঠেছিল মোরগ। বুধন ঘুম থেকে উঠে মনিবের গোরু-ছাগলকে জাবনা দিল। বুধনের বাবাও গোরুর দুধ দুইতে শুরু করল। দুধ দুয়ে আজ সে খুব খুশি, কারণ অন্যদিনের তুলনায় আজ অনেক বেশি দুধ পেয়েছে সে। ছেলের পিঠ চাপড়ে সে বলল, “বুধন, বর্ষায় ঘাসগুলো খুব তাজা হয়েছে, না রে? এই ঘাস খেয়েই গোরুগুলো ভাল দুধ দিচ্ছে। মনিব আজ আমাদের ওপর খুব খুশি হবে।”

দুধ দেখে বুধনেরও খুব আনন্দ। সে গামছায় মুড়ি বেঁধে হাতে একটা বাঁশের বাঁশি নিয়ে দূরে মাঠের দিকে চলে গেল।

মুড়ির সঙ্গে লুকিয়ে গামছার মধ্যে করে নিয়ে যায় সে তার অতি আদরের বাঁশিটা। বুধনের বয়স মাত্র দশ বছর। সারাদিন তাকে মাঠে মাঠে গোরু চরাতে হয়। সন্ধের সময় ঘরে ফিরেও তার ছুটি নেই। মনিবের গা টিপে দিতে হয়, গোরু-বাছুরের কাজ করতে বুধনের ভালই লাগে। এরা তার সঙ্গী। বাছুরেরা ওর সঙ্গে দুষ্টুমি করলে রাগে দু'চার ঘা বসিয়ে দেয়, কিন্তু তারা ওকে কিছু বলে না, গুঁতিয়েও দেয় না, বরং অনেক সময় তারা ছোট-ছোট শিং দিয়ে বুধনের পিঠ চুলকে দেয়। মাঠে যখন সে একা-একা বাঁশি বাজায়, এরা তখন শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশি শোনে। গোরু-বাছুররাই তার সারাদিনের সবচেয়ে ভাল বন্ধু। কিন্তু মনিবের কাছে যেতেই বুধনের ভয় লাগে। ইয়া মোটা গোঁফ তার, চোখ পাকিয়ে এমন করে বুধনকে নানারকম কাজ করতে বলে যে, মনিবকে দেখলেই তার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

গাছতলায় বসে বুধন যখন মনিবের গোরুগুলোকে পাহারা দেয়, তখন দেখতে পায় তার বয়সী কত ছেলে-মেয়ে হাতে বইখাতা নিয়ে নয়তো কাঁধে ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, তাদের অনেকেই বুধনের মতো আদিবাসী। তারও ইচ্ছে করে, স্কুলে যাবে, বই পড়বে, বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করবে। কিন্তু সেই সুযোগ তার নেই। তার মনিব, তার বাবারও মনিব, রামদেও সিংয়ের কড়া হুকুম, স্কুলে যাওয়া চলবে না। লেখাপড়া করলে কাজ করবে কে? ওসব ভদ্রলোকদের জন্যে।

নিজের দুঃখের কথা চিন্তা করে যখন কান্না পায়, তখনই সে বাঁশি বাজায়। চোখ বন্ধ করে বিভোর হয়ে বাঁশি বাজাতে

বাজাতে সব দুঃখ সে ভুলে যায়। মেলা থেকে তার বাবা তাকে এই বাঁশি কিনে দিয়েছিল।

মাঠের শেষে যে আদিবাসী স্কুল আছে, সেই স্কুলের এক মাস্টারমশাই হরিকান্ত ত্রিপাঠী প্রতিদিনই দেখেন মিষ্টি চেহারার এই আদিবাসী ছেলেটিকে। একদিন বাঁশি শুনে নিজেই তিনি বুধনের সঙ্গে আলাপ করলেন। বললেন, "চল্ না, আমার ইস্কুলে পড়বি।"

বুধনের খুব আনন্দ হয়েছিল মাস্টারজির এই কথা শুনে। বলেছিল, "কেন পড়ব না? নিশ্চয় পড়ব। বাবাকে বলে আপনার ইস্কুলে ভর্তি হয়ে যাব।"

বুধন সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে বাবাকে বলল, "বাবা, আমায় ইস্কুলে ভর্তি করে দাও, মাস্টারজি বলেছে।" বলেই দেখল, ওর বাবার দুটো চোখ জলে ভর্তি হয়ে গেছে। বুধনের বাবা বলল, "তুই ইস্কুলে ভর্তি হলে আমাদের মনিব যে আমাদের তাড়িয়ে দেবে। কী খাব তখন আমরা?"

"কেন? তুমি লোকের খেতিতে কাজ করবে, খাটিয়া বানিয়ে বিক্রি করবে।"

খেতিতে কাজ করার কথা শুনে বুকটা ধক্ করে উঠল বুধনের বাবার। কী বোঝাবে সে তার ছেলেকে?

মুণ্ডা, ওরাওঁ, বীরহোর, সাঁওতাল, এইসব আদিবাসীরা আগে ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগনা, আর সিংভূম এলাকার জঙ্গলে বাস করত। জঙ্গলের মাঝে-মাঝে ছিল আদিবাসী গ্রাম। সেখানে উঁচু, নিচু, ধনী, দরিদ্রের ভেদাভেদ ছিল না। সর্দারের কথামতো তারা চলত। জঙ্গল ছিল তাদের নিজেদের। তারা জঙ্গলের কাঠ কাটত, মাঠে ফসল ফলাত, একসঙ্গে শিকার করত। যে যা পেত, সকলে মিলে ভাগ করে খেত। বুধনের বাবা শুনেছে, সভ্য মানুষগুলো এসেই তাদের একসঙ্গে থাকার আনন্দ নষ্ট করেছে।

ইংরেজরা জমিদার বসিয়েছে তাদের ওপরে। পাথুরে জমিতে ফসল যেটুকু ফলত, তার বেশিটাই নিয়ে নিত জমিদাররা। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে বছরের খোরাকও চাষিরা যোগাড় করতে পারত না। খাজনা দিতে না পারলে প্রায়ই জমিদারদের লেঠেলরা তাদের মারধোর করত। এইভাবেই তারা দলে দলে সুন্দর প্রকৃতির কোল ছেড়ে দু' মুঠো অন্নের জন্য এদিক-ওদিক ছড়িয়ে গেছে। কুলিমজুরের কাজ করার জন্য তারা শহরের দিকে পা বাড়িয়েছে। এ-সমস্ত কথা বুধন শুনেছে তার বাবা আর ঠাকুর্দার মুখ থেকে। কিন্তু যেটুকু সরল সুন্দর জীবন ছোট বয়েসে সে দেখেছে, আজ সেটুকুও সে দেখতে পায় না। এখনও মুণ্ডা, ওরাওঁদের পল্লীতে রাত্রিবেলা বাঁশি বাজে, মাদল বাজে, কিন্তু সেই আনন্দ কি তারা পায়, যা আগে পেত?

বুধনের বাবার ঘর ছিল হাতিয়ায়। একদিন তাদের গ্রামের লোকেরা দেখল গাড়ি করে লোক এল। পরে দেখল, গ্রামে আরও গাড়ি আসছে, আরও লোকজন আসছে। জিজ্ঞাসা করে তারা জানল, হাতিয়ায় কারখানা হবে। সকলকে বলা হল, "তোমাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।" গ্রামবাসীদের বুকে ধক্ করে আগুন জ্বলে উঠল। সর্দার বলল, "জমি আমরা ছাড়ব না।" বুধনের বাবাও বলেছিল, "জমি ছাড়ব না।"

কারখানার লোকেরা বোঝাল, "তোমাদের সকলকে বেশি মাইনের চাকরি দেব আমরা, তোমাদের আর কষ্ট থাকবে না।" যারা তখনও জমি ছাড়তে চায়নি, পুলিশ তাদের হটিয়ে দিল। বুধনের বাবা পুলিশের মার খেয়ে বাড়ি ছাড়ার পর অনেক খুঁজেপেতে রামদেও সিংয়ের বাড়িতে কাজ পেয়েছে।

বুধনের বাবা বলল, "না রে বুধন, তোর লেখাপড়া হবে না। মনিবের কাছে টিপসই দিয়ে টাকা নিয়েছিলুম, সে টাকা আজও শোধ করতে পারিনি। তোর মায়ের অসুখের সময় সিংজি আমাকে সে টাকা দিয়েছিল। এখন এত টাকা সুদ হয়ে গেছে..."

আর বলতে পারল না সে, গলার মধ্যে বাকি কথা আটকে গেল।

"কী হয়েছে বাবা, আর বলছ না কেন?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বুধনের বাবা বলল, "মনিব বলেছে ও টাকা আর শুধতে হবে না, কিন্তু সারা জীবন কাজ করে দিতে হবে।"

বুধন এ-কথা শুনে কেঁদে ফেলল। সে বুঝে গেল যে, বাবার মতো তাকেও সারা জীবন ওই গোঁফওলার চোখ-রাঙানি সহ্য করতে হবে। লেখাপড়াও শিখতে পারবে না, নিজের ঘরেও থাকতে পারবে না। বুধন কাঁদতে-কাঁদতে বাবাকে বলল, "চলো, রাতের বেলা বাপ-বেটায় পালিয়ে যাই। কেউ টের পাবে না। এখানে থাকব না আমি।"

বুধনের বাবা ছেলের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে শান্ত করতে লাগল। অনেক বোঝাল ছেলেকে, "ওরে, ভগবানকে ডাক, তিনি আমাদের সব দুঃখ দূর করে দেবেন। আমরা বোকা আদিবাসী। আমরা সিংজির নজর এড়িয়ে পালাতে গিয়ে ঠিক ধরা পড়ে যাব।"

"আমরা টাটানগরে চলে যাব। সিংজি আমাদের খুঁজে পাবে না। চলো বাবা।"

"যা বুধন, ঘুমুতে যা, মাথা গরম করিস না। কালকে সকালে আবার তোকে গোরু চরাতে যেতে হবে।"

বুধন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ডাল দিয়ে রুটি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিনের মতো বুধন গোয়ালে গেল গোরুর জাবনা দিতে। গিয়ে দেখল তার বাবা জাবনা দিয়ে দিয়েছে। ছেলেকে দেখতে পেয়ে বুধনের বাবা বলল, "আজ থেকে আর তোকে গোরুর জাবনা দিতে হবে না, আমিই দেব। যা, দাঁতন করে মুড়ি বেঁধে নে।"

নিমগাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে বুধনের মনে হল, বাবা বোধহয় ওর ওপর রেগে গেছে। সে আর কোনো কথা না বলে মুখ ধুয়ে মুড়ি বেঁধে গোরুর পাল নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল।

সেদিন ছিল রবিবার। ছুটির দিন। স্কুল বন্ধ। তাই কোনো ছেলেমেয়েকে সেদিন কাঁধে ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যেতে দেখা গেল না। বুধন একা আপন মনে গাছের গোড়ায় বসে আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ পরে চেঁচামেচির শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। দেখল, ওরই বয়সী অনেক ছেলে চাল, ডাল, আলু, কাঠ নিয়ে এসে চড়ুইভাতি করছে। ওদের সঙ্গে সেই মাস্টারজিও আছেন। হৈহৈ ব্যাপার! কেউ জল আনছে। কেউ বা উনুনের আগুনে কাঠ দিচ্ছে। চুপচাপ বসে বুধন এইসব কাণ্ড দেখছে এমন

সময় মাস্টারজি এসে বললেন, "কী রে, আসবি আমাদের সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ।" বলে বুধন কাজে লেগে গেল ওদের সঙ্গে। মনের আনন্দে বুধন তরকারি কুটল, কাঠের টুকরো উনুনে ঢোকাল, আরও কত কী করল।

বুধন যাদের সঙ্গে সমস্ত দিনটা কাটায়, সেই গোরু-বাছুরের দল বোধহয় কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ তারা বুধনকে কোনোদিন মাঠের মধ্যে এসব করতে দেখেনি। তারাও এদিক-ওদিক চরে বেড়িয়ে একে একে মাঠে এসে বুধনের চড়ুইভাতি করা দেখতে লাগল।

রান্নাবান্না শেষ হতে দিন গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। তারপর সকলে খেতে বসল মাঠের ওপর গোল হয়ে। বুধন গোরুদের বলল, "তোরা বসে থাক। আমাদের খাওয়া হয়ে গেলে কলাপাতা, শালপাতা পাবি।"

বুধনের ভাষা গোরু-বাছুর বোঝে। বুধনও তাদের ভাষা, তাদের দুঃখ বুঝতে পারে। বুধনের ওপর আজ গোরুদের খুব রাগ হল। ওরা ভাবল, বুধন তাদের সঙ্গ ছেড়ে অন্য সকলের সঙ্গে মিশছে। দু-একটা গোরু তো রাগে বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল।

কয়েকটা গোরু ঘরে ফিরে এল, অথচ বুধন ফিরল না দেখে বুধনের বাবার দুশ্চিন্তা হল। বুধনের মনিবও জিজ্ঞেস করল বুধনের বাবাকে, "বুধন ফিরল না কেন ? ও মাঠে কী করছে ?"

বুধনের বাবা আমতা-আমতা করে বলল, "ছেলে বায়না করেছিল ইস্কুলে পড়বে। আমি বারণ করেছিলুম। সেই রাগে ও আজ ফিরল না কি না, বুঝতে পারছি না।"

"কী ? এত বড় সাহস হয়ে গেছে ওর ?" বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল রামদেও সিং। "চল আমার সঙ্গে। তোর ছেলেকে আদর দিয়ে মাথায় চড়িয়ে দিয়েছিস, দেখি ও ফেরে কি না।" বুধনের বাবাকে নিয়ে সিংজি মাঠের দিকে এগোল। যে-কটা গোরু ফিরে এসেছিল, ওদের পেছনে-পেছনে তারাও আবার চলল মাঠের দিকে।

মাঠে পৌঁছে বুধনের বাবার মুখে হাসি ফুটল। ছেলে খুশি মনে অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে হাডুডু খেলছে দেখে মন আনন্দে ভরে গেল তার। কিন্তু রামদেও সিং দাঁতে দাঁত চেপে চেঁচিয়ে উঠল, "বুধন, তুই এদিকে আয়। খুব সাহস হয়ে গেছে তোর, না ?"

রামদেওয়ের চিৎকারে বুধনের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। ভয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। যে-সব ছেলের সঙ্গে বুধন খেলছিল, তারা কিছু বুঝতে না পেরে, খেলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। বুধন দল থেকে বেরিয়ে মনিবের সামনে এসে দাঁড়াল। মাস্টারজি খাবার-দাবার খেয়ে দূরে বসে ঝিমুচ্ছিলেন। রামদেও সিংয়ের চিৎকারে তিনি চমকে উঠে দেখলেন, মোটা একজন লোকের দিকে তাঁর স্কুলের ছেলের দল এগোচ্ছে। উনি ভাবলেন, ছেলেরা বোধহয় কোনোরকম দুষ্টুমি করেছে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে। সেই জন্যে তিনি 'কী হয়েছে, কী হয়েছে' বলতে বলতে তাড়াহুড়ো করে রামদেওয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। শুনলেন, বুধনকে রামদেও নানারকমভাবে শাসাচ্ছে।

দু' তিন মিনিটের মধ্যে মাস্টারজি বুঝতে পারলেন, ওই

গোঁফওয়ালা লোকটা বুধনের মনিব। মাস্টারজি রামদেওকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "এইটুকু ছেলে, ওকে এভাবে বকবেন না। ছোট-ছোট ছেলেপুলেদের সঙ্গে মজা করে ফিস্টি করেছে, কোনো অন্যায় তো সে করেনি।"

রামদেও চড়া গলায় বলল, "আলবত করেছে। ও আমার চাকর। আমারই কাজে ফাঁকি দিয়ে খেলা করবে ?"

"কেন, আপনার ছেলেমেয়েরা কি খেলে না ?"

"চুপ করুন। আমার ছেলে ওর মনিব। ছোটলোকদের মাথায় তুলবেন না বলছি।"

এই কথা শুনে মাস্টারজি খুব খেপে গেলেন। বললেন, "আপনি ছোটলোক, না হলে এত ভাল ছেলেকে ছোটলোক বলেন কী করে ?"

মাস্টারজির কথা শুনে সব ছেলে হোহো করে হেসে উঠল। রামদেওয়ের মাথায় তাতে আগুন জ্বলে উঠল। সে বুধনের গালে ঠাস করে এক চড় মেরে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে বলতে লাগল, "তোর জন্যেই আমার এত অপমান হল। আজ তোকে মেরে শেষ করে দেব।"

বুধনের বাবা অনেক সহ্য করেছে। কিন্তু আর সে নির্বাক দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। রামদেওয়ের হাত চেপে ধরল সে। আর তখনই ঘটল এক আশ্চর্য ব্যাপার। মুহূর্তের মধ্যে চারপাশ থেকে বুধনের আদরের গোরু-বাছুরের দল রামদেওকে শিং দিয়ে গুঁতোতে শুরু করে দিল। রামদেও মাটির ওপর পড়ে গেল। তার সমস্ত শরীর রক্তাক্ত। যন্ত্রণায় সে চেঁচাতে লাগল, "বাঁচাও, বাঁচাও।"

বুধন এতক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। এইবারে সে গোরুগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল। দু' হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "থাম্, থাম্ তোরা। মনিবকে তোরা মারিস না। মনিবের ছেলে আছে। সে কাঁদবে। তার বাবাকে মারলে সে কাঁদবে। থাম্ তোরা, থাম্।"

মাস্টারজি এসে জড়িয়ে ধরলেন বুধনকে। তারপর রামদেও সিংকে বললেন, "এই ছোটলোকের জন্যেই আপনি আজ বেঁচে গেলেন সিংজি।"

ছবি : দেবাশিস দেব

গ্রাহক নেওয়া চলছে

অভাবনীয় আনন্দ-উপহার

এক খণ্ডে

শরৎসাহিত্যসমগ্র

এককালীন গ্রাহকমূল্য ৯০ টাকা

সম্পাদনা ও দীর্ঘ ভূমিকা : সুকুমার সেন

অমর কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যাবতীয় উপন্যাস ও অন্যান্য সমুদয় সাহিত্যকর্ম এক মলাটের মধ্যে ছাপা হয়ে বেরুচ্ছে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে। সুকুমার সেনের সম্পাদনা-ও দীর্ঘ ভূমিকা-সমৃদ্ধ এই অখণ্ড গ্রন্থের নাম 'শরৎসাহিত্যসমগ্র'। বাঙালী পাঠকের ঘরে-ঘরে অপরাজেয় কথাশিল্পীকে পৌঁছে দেবার মহান সংকল্পে উদ্বুদ্ধ এই প্রকাশনার মান যেমন উঁচু, দাম তেমনি সুলভ।

সব-সেরা টিস্যু কাগজ। সুবিধাজনক ও শোভন আয়তন। সানন্দে পড়া যায় এমন ১২ পয়েন্ট ফোটো-সেট হরফ। অফসেটে ছাপা। দামী কাপড়ে ও বোর্ডে বাঁধাই। প্লাস্টিক ল্যামিনেটেড জ্যাকেট। বাজার-চলতি সংস্করণের ফোটোকপি নয়, নতুনভাবে সাজানো। কেউ যদি প্রিয়জনকে এই অমূল্য গ্রন্থ উপহার হিসেবে পাঠাতে চান, তারও ব্যবস্থা রয়েছে।

অখণ্ড 'শরৎসাহিত্যসমগ্র'র মূল দাম **১২০ টাকা**। আগাম গ্রাহকদের জন্য এককালীন গ্রাহকমূল্য **৯০ টাকা**।

-কিস্তিতে দিলে গ্রাহকমূল্য **৫০ টাকা** করে **১০০ টাকা**। ডাকে নিলে সবক্ষেত্রেই ৬·৫০ পোস্টাল চার্জ অতিরিক্ত দিতে হবে।

তিন ভাবে গ্রাহক নেওয়া চলছে

□ ৬৭-এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯ ঠিকানায় অবস্থিত আনন্দ পাবলিশার্স-এর ছোটদের বইয়ের দোকানে মুদ্রিত আবেদনপত্র পূরণ করে, টাকা জমা দিয়ে, গ্রাহক হবার ব্যবস্থা রয়েছে।

□ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯ এই ঠিকানায় ডাকে টাকা পাঠালেও সরাসরি গ্রাহক করে নেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে মুদ্রিত আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে না। এখানে টাকা পাঠাতে হবে মনি অর্ডারে কিংবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে। বাইরের স্টেশনের চেক নেওয়া হবে না।

□ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সারা ভারতের নির্বাচিত ১২৯টি শাখার মাধ্যমেও গ্রাহক হওয়া চলছে। তালিকা নীচে দেওয়া হল। ব্যাঙ্কে মুদ্রিত আবেদনপত্র পূরণ করে, টাকা জমা দিয়ে, গ্রাহক হতে হবে। যিনি যে-শাখায় গ্রাহক হবেন, সেখান থেকেই তিনি বই পাবেন।

যাঁরা এর আগে প্রকাশকের ঠিকানায় গ্রাহক হবার জন্য টাকা পাঠিয়েছেন অথচ বই পাঠাবার ডাকখরচ হিসেবে অতিরিক্ত ৬·৫০ পাঠাননি তাঁরা দয়া করে অনতিবিলম্বে ৬·৫০ টাকার পোস্টাল চার্জ পাঠিয়ে দেবেন।

ভি· পি· পিতে অখণ্ড 'শরৎসাহিত্যসমগ্র' পাঠানো হবে না। গ্রাহক হবার পর মোটামুটিভাবে চার মাসের মধ্যেই যাতে গ্রাহকরা বই পান, তার জন্য সব রকমভাবে চেষ্টা চলছে। বই বেরুলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হবে।

ইউ· বি· আই-র শাখাসমূহের তালিকা

কলকাতা ১ কলেজ স্ট্রীট ২ ডালহৌসি স্কোয়ার ৩ ধর্মতলা ৪ নেতাজী সুভাষ রোড ৫ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট **কলকাতা মেট্রোপলিটন** ৬ বরানগর ৭ বেহালা ৮ ভবানীপুর ৯ দেশপ্রিয় পার্ক ১০ ঢাকুরিয়া ১১ দমদম ১২ ডানলপ ব্রিজ ১৩ গাঙ্গুলী বাগান ১৪ গড়িয়াহাট ১৫ গোরাবাজার ১৬ হাজরা রোড ১৭ হাওড়া ১৮ যাদবপুর ১৯ কদমতলা ২০ নিউ আলিপুর ২১ নিউ মানিকতলা ২২ সালকিয়া ২৩ সল্ট লেক ২৪ শিয়ালদহ ২৫ শিবপুর ২৬ শ্যামবাজার ২৭ টালিগঞ্জ ২৮ উল্টোডাঙ্গা স্টেশান **পশ্চিমবঙ্গ** ২৯ আদ্রা ৩০ আলিপুরদুয়ার ৩১ আমতা ৩২ আন্দুল ৩৩ আরামবাগ ৩৪ আসানসোল ৩৫ বাগনান ৩৬ বালুরঘাট ৩৭ বাঁকুড়া ৩৮ বারাসাত ৩৯ বারাকপুর ৪০ বারুইপুর চৌধুরী বাজার ৪১ বসিরহাট ৪২ বাটানগর ৪৩ বেরাচম্পা ৪৪ বহরমপুর ৪৫ বিষ্ণুপুর ৪৬ বোলপুর ৪৭ বর্ধমান ৪৮ বার্নপুর ৪৯ ক্যানিং ৫০ চন্দননগর তেমাথা ৫১ চুঁচুড়া ৫২ কাঁথি ৫৩ কুচবিহার ৫৪ দার্জিলিং ৫৫ ডায়মণ্ডহারবার ৫৬ দুর্গাপুর ৫৭ গরবেতা ৫৮ হাবড়া ৫৯ জলপাইগুড়ি ৬০ ঝাড়গ্রাম ৬১ কাকদ্বীপ ৬২ কাচরাপাড়া ৬৩ কান্দী ৬৪ কাটোয়া ৬৫ খড়্গপুর ৬৬ কৃষ্ণনগর ৬৭ মালদা ৬৮ মেদিনীপুর ৬৯ নবদ্বীপ ৭০ পুরুলিয়া ৭১ রামপুরহাট ৭২ রাণীগঞ্জ ৭৩ শ্রীরামপুর ৭৪ শিলিগুড়ি ৭৫ সিউড়ী ৭৬ তমলুক ৭৭ উত্তরপাড়া **আসাম** ৭৮ বনগাঁইগাও ৭৯ ধুবড়ি ৮০ ডিব্রুগড় ৮১ ডিগবয় ৮২ গৌহাটি ৮৩ জোরহাট ৮৪ করিমগঞ্জ ৮৫ পানিগাঁও ৮৬ শিলচর ৮৭ তেজপুর ৮৮ তিনসুকিয়া **মেঘালয়** ৮৯ শিলং **নাগাল্যাণ্ড** ৯০ ডিমাপুর **মণিপুর** ৯১ ইম্ফল **ত্রিপুরা** ৯২ আগরতলা **বিহার** ৯৩ বারাউনি ৯৪ ভাগলপুর ৯৫ বোকারো স্টিল সিটি ৯৬ দ্বারভাঙা ৯৭ দেওঘর ৯৮ ধানবাদ ৯৯ গয়া ১০০ ঘাটশিলা ১০১ গিরিডি ১০২ জামশেদপুর ১০৩ কাটিহার ১০৪ কিষানগঞ্জ ১০৫ মুজাফফরপুর ১০৬ পাটনা ১০৭ পূর্ণিয়া ১০৮ রাঁচি **উড়িষ্যা** ১০৯ বালাসোর ১১০ বহরমপুর (গঞ্জাম) ১১১ ভুবনেশ্বর ১১২ কটক ১১৩ পুরী ১১৪ রাউরকেল্লা **উত্তরপ্রদেশ** ১১৫ এলাহাবাদ ১১৬ কানপুর ১১৭ লক্ষ্ণৌ ১১৮ বারাণসী **দিল্লী** ১১৯ চিত্তরঞ্জন পার্ক ১২০ কনট প্লেস ১২১ করলবাগ **মহারাষ্ট্র** ১২২ বম্বে ১২৩ চেম্বুর ১২৪ নাগপুর ১২৫ পুনা **গুজরাট** ১২৬ আমেদাবাদ **তামিলনাড়ু** ১২৭ মাদ্রাজ ১২৮ মাউন্ট রোড **কর্ণাটক** ১২৯ বাঙ্গালোর

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর ইরানি এসেছে বর্ধমানের একটি গ্রামে। ওদের জ্যাঠামশাই চাকরি থেকে রিটায়ার করে সেই গ্রামে অনেক রকম বাগান করেছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্তিরবেলা তিনি একা-একা লেবুবাগানে গিয়েছিলেন, তারপর থেকেই তিনি উধাও। এখানকার লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। দিপু তার দিদিকে কিছু না জানিয়ে মাঝরাতে বাইরে বেরিয়ে পুকুরধারে একজন রহস্যময় লোকের দেখা পেল। তারপর আর দিপুও ফিরে এল না। সকালবেলা ইরানি তার ভাইকে দেখতে না পেয়ে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। কোনওক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে গেল কাছাকাছি থানায় খবর দিতে। থানার বড়বাবু তাকে নিয়ে গেলেন সাধুবাবার কাছে। সেখানে হঠাৎ প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হল। সাধুবাবা ইরানিকে বললেন সেই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে দিপুর নাম ধরে ডাকতে। তারপর···

কুঁড়েঘরের দরজার কাছে সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখছে ইরানিকে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে ইরানি, হাজার হাজার তীরের মতন বৃষ্টির ঝাঁক যেন বিঁধে যাচ্ছে তার গায়ে। এত জোর বৃষ্টি সাধারণত দেখা যায় না। শব্দ হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন। সেই শব্দ ছাপিয়েও শোনা যাচ্ছে ইরানির তীক্ষ্ণ গলার ডাক, দিপু, দিপু, দিপু !

দারোগাবাবুর এই দৃশ্য সহ্য হল না। বিরক্তিতে তাঁর মুখখানা একখানা ভিমরুলের চাক হয়ে গেল।

একটু পরেই তিনি বলে উঠলেন, "এসব কী পাগলের কাণ্ড হচ্ছে ? অ্যাঁ ? মেয়েটাকে এই বৃষ্টিতে ভেজাচ্ছেন, ওর নিউমোনিয়া হয়ে যাবে যে !"

সাধুবাবা বললেন, "ভয় নেই, সে রকম কিছু হবে না।"

দারোগাবাবু বললেন, "দেখুন মশাই, আপনি সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, আপনার মুখের ওপর কিছু বলতে সাহস হয় না। মন্তর-টন্তর দিয়ে কী করে দেবেন তার ঠিক নেই তো ! তবু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, মেয়েটার যদি কিছু কঠিন অসুখ হয়, তার জন্য আপনি দায়ী হবেন ?"

সাধুবাবা বললেন, "অল্প বয়েস, বৃষ্টি ভিজলে কী আর এমন ক্ষতি হবে ? বাচ্চারা তো ইচ্ছে করে প্রায়ই এমন ভেজে। তা আপনি যদি চান, তাহলে মেয়েটিকে ডেকে ফিরিয়ে আনুন !"

খয়েরলালের কথাবার্তায় যে একটা ওপরচালাকির ভাব ছিল, এখন আর সেটা নেই। সে যে নিজেই আগে ট্রেনে ডাকাতি করত, এটা সাধুবাবা তার মুখ দেখে বলে দিয়েছেন। এজন্য তার খুব ভক্তি হয়েছে সাধুবাবার ওপর।

সে এবারে বলল, "না, না, সাধুবাবা যা বলছেন তাই-ই করতে দিন। উনি গুণী লোক !"

পরের মুহূর্তেই ঠিক ম্যাজিকের মতন একসঙ্গে তিনটে কাণ্ড হল।

প্রচণ্ড জোরে বান ডাকার শব্দ হল, বৃষ্টি থেমে গেল হঠাৎ, আর ইরানি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

দারোগা বাজের শব্দে দু' হাতে মাথা চাপা দিলেন এবং ইরানির লুটিয়ে পড়ার দৃশ্য দেখে তাঁর চোখ কপালে উঠল। মাথা থেকে হাত নামিয়ে তিনি সাধুবাবার কাঁধ চেপে ধরে বললেন, "মেরে ফেললেন, আপনি মেয়েটাকে মেরে ফেললেন !"

খয়েরলাল ছুটে চলে গেল ইরানির দিকে।

সাধুবাবা বলতে লাগলেন, "ছাড়ুন, আমাকে ছাড়ুন, মেয়েটিকে আগে গিয়ে দেখি !"

দারোগাবাবু বজ্রমুঠিতে তাঁকে ধরে রেখে বললেন, "না, ছাড়ব না। আপনি সাধু হোন আর যা-ই হোন, ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট !"

খয়েরলাল চেঁচিয়ে বলল, "এদিকে একবার আসুন তো। ঠিক বুঝতে পারছি না।"

সাধুবাবু দারোগাবাবুর দিকে মুখ করে কঠিনভাবে বললেন, "ছেলেমানুষি করবেন না, ছাড়ুন আমাকে। মেয়েটির যদি সত্যি কিছু হয়, তবে তার ফল ভোগ করতে হবে আপনাকেই !"

দারোগাবাবু এতেও সাধুবাবাকে একেবারে ছাড়লেন না, তাঁর একটা হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে এলেন ইরানির কাছে।

খয়েরলাল বলল, "মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে গেছে !"

দারোগাবাবু বললেন, "মাথায় বাজ পড়েছে ! কী আওয়াজ, যেন একসঙ্গে দশখানা কামান। এই বাজ পড়লে কেউ বাঁচে ? দেখছ না মুখখানা নীল হয়ে গেছে !"

সাধুবাবা নিচু হয়ে ইরানির কপালে হাত ছোঁয়ালেন। ইরানির চোখ দুটি বোজা। উনি আঙুল বুলিয়ে দিলেন চোখের পাতায়। তারপর বললেন, "ভয় নেই, কিছু ভয় নেই !"

দারোগাবাবু বললেন, "দেখুন তো, নিশ্বাস পড়ছে কি না !"

সাধুবাবা বললেন, "বললুম তো ভয় নেই। মেঘের গর্জন হলেই মাটিতে বাজ পড়ে না।"

দারোগাবাবু বললেন, "জল নিয়ে এসো ! ওর মাথায় জল ছেটাও !"

সাধুবাবা বললেন, "আশ্চর্য ! এতক্ষণ যে বৃষ্টিতে ভিজেছে, তার মাথায় আবার জল দিতে হবে কেন ? কিচ্ছু দরকার নেই।"

তিনি ইরানিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে চলে এলেন ঘরের মধ্যে। তাঁর নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললেন, "থাক, ও এমনি থাক।"

দারোগাবাবু বললেন, "ওর বাপ-মায়ের কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই ? কলকাতা থেকে এত দূরে পাঠিয়ে দিয়েছে, সঙ্গে বড় কেউ আসেনি ? ছেলেটা গেল নিরুদ্দেশ হয়ে আর মেয়েটা শ্মশানঘাটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। এখন ওদের বাপ-মায়ের কাছে কী করে খবর পাঠাই ? কোথায় বাড়ি, তাও তো জানি না !"

খয়েরলাল বলল, "মেয়েটার খুব সাহস ! ট্রেনে আসবার

একটা ব্রণ, তারপর আরও একটা, এমনি ভাবে ব্রণ বাড়তেই থাকে।
তাইতো আপনার দরকার বিশেষ ক্রিয়াযুক্ত উন্নত মানের ক্লিয়ারাসিল।

নতুন উন্নত
ক্লিয়ারাসিল

অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ট্রাইক্লোসানযুক্ত

যা, ব্রণ সাফ ক'রে দেয় আর তা ছড়িয়ে পড়াও নিবারণ করে।

ব্রণ হ'ল বয়স বাড়ারই একটি অঙ্গবিশেষ। কৈশোরত্বে পা দেওয়ার পর কতবার ব্রণ বেরোতে থাকে, আবার মিলিয়ে যেতে থাকে—কিন্তু, ঐ ব্রণকে তখন অবহেলা করলে বা তার জন্যে শুধু বসে বসে চিন্তা করলেই তো আর কোনো সুরাহা হয়না, বা ওগুলি নখ দিয়ে টিপে দিয়েও দূর করা যায় না—তাতে শুধু জীবাণু আরও ছড়িয়ে পড়ে আর আরও ব্রণ বেরোতে সাহায্য করে।

ব্রণর সমস্যায় এই ট্রাইক্লোসানযুক্ত নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল, সবচেয়ে বেশী কার্য্যকরী কেন :

এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল যে শুধু ব্রণ সাফই ক'রে দেয় তা নয়, তা ছড়িয়ে পড়াও নিবারণ করে—কারণ, এতে যে থাকে একটি বিশেষ অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ওষুধযুক্ত ট্রাইক্লোসান। ট্রাইক্লোসানযুক্ত এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল, জীবাণু থেকে হওয়া ব্রণকে বাড়তে দেয় না —আর, ত্বকের বাকী অংশগুলিও দূষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে, আর তাই, ব্রণও আর বাড়তে পারে না।

এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল থেকে কিভাবে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়

প্রথমে মুখটি ধুয়ে নিন। তারপর এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল সারা মুখে লাগান—আর, ব্রণর ওপর একটু বেশী ক'রে লাগান। সবচেয়ে ভাল ফল পেতে হলে এই নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল একনাগাড়ে কিছুকাল ধরে, সকাল ও রাত্রি, দিনে কমপক্ষে এই দুবার ক'রে লাগিয়ে যান।

ট্রাইক্লোসানযুক্ত নতুন ক্লিয়ারাসিল তিন ভাবে কাজ করে

ব্রণকে খুলে দেয়
এর বিশেষ ওষুধ, ব্রণর মুখের হাল ছাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

ব্যাকটিরিয়ার প্রতিরোধ করে
নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল-এ আছে, এক অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ট্রাইক্লোসান। যে ব্যাকটিরিয়া থেকে ব্রণ হয় বা তা ছড়িয়ে পড়ে, তার এটি প্রতিরোধ করে।

ব্রণ শুকিয়ে দেয়
অতিরিক্ত তেল শুষে নিয়ে, ব্রণ শুকিয়ে দিতে সাহায্য করে।

নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল মুখের লোম কূপও নরম করে আলগা করে দিতে পারে।

এর সঙ্গে এও পাবেন ঃ
ক্লিয়ারাসিল ভ্যানিশিং মেডিকেশন

OBM/3556 BEN

সময় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তো! সেই ট্রেনের কামরাতেই একদল চ্যাংড়া ডাকাত উঠেছিল, তাদের সঙ্গে রিভলভার পর্যন্ত ছিল। আমি তো দেখছি, ডাকাতের সামনে পড়লে কত হোমরাচোমরা লোকও ভয়ের চোটে কেঁদে ফেলে। কিন্তু এই মেয়েটা ভয় পায়নি। ডাকাতদের মুখে মুখে কথা বলেছে। বলতে পারেন, অনেকটা ওর জন্যই আমি ডাকাত-দলটাকে ঘায়েল করতে পেরেছি!"

সাধুবাবা বললেন, "মেয়েটির মনের জোর খুব সাংঘাতিক। ওই যে আমি বললুম, আর কোনও কিছু না ভেবে শুধু তোমার ভাইয়ের মুখটা চিন্তা করো, সেটা করা খুব শক্ত। সবাই পারে না। কোনও একটা জিনিস চিন্তা করতে গেলেই অন্য আরও পাঁচ রকম কথা মনে আসে।"

খয়েরলাল জিজ্ঞেস করল, "আপনি ধ্যান করার কথা বলছেন?"

সাধুবাবা বললেন, "হ্যাঁ, তা বলতে পারো। কেউ ভগবানের নামে ধ্যান করে, কেউ কোনও মানুষের জন্য ধ্যান করে। সত্যিকারের একমনে কারুর কথা চিন্তা করতে পারলে অনেক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে হয়। এই মেয়েটিরও তাই হয়েছে।"

দারোগাবাবু বললেন, "এখন তো ওর চিকিৎসা করার দরকার।"

সাধুবাবা বললেন, "কিচ্ছু দরকার নেই।"

"আপনি দায়িত্ব নিচ্ছেন?"

"হ্যাঁ, নিচ্ছি। চলুন, আমরা বাইরে যাই, এখানে বেশি কথাবার্তা বললে ওর অসুবিধে হবে।"

বৃষ্টি থামতেই দেবীদাস তার বউ আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে সরে পড়েছে। রোদ উঠে গেলে, আকাশে ভাসছে সাদা-সাদা পাতলা মেঘ। একটু আগে যে এখানে সাংঘাতিক ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে, তা বোঝার কোনও উপায় নেই, শুধু মাটি ভিজে আছে।

খয়েরলাল বলল, "সাধুবাবা, একটা কথা বুঝিয়ে দেবেন? আপনি বৃষ্টির মধ্যে ওই মেয়েটিকে পাঠালেন ওর ভাইয়ের নাম ধরে ডাকবার জন্য। ওর ভাই কি এ ডাক শুনতে পাবে? সে কি কাছাকাছি আছে?"

দারোগাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এটা জানতে চাই। আমাকে রিপোর্ট লিখতে হবে। যা ঘটল, সব যদি লিখি, তা হলে যে-কেউ ভাববে আমি গাঁজাখুরি গপ্পো বানিয়েছি।"

বৃষ্টিতে সাধুবাবার ধুনি নিভে গেছে। ঘর থেকে তিনি কয়েকখানা শুকনো কাঠ এনে আবার আগুন জ্বালতে লাগলেন। আগুন জ্বলে ওঠার পর তিনি বললেন, "আমি যা বলব, তা হয়তো আপনাদের বিশ্বাস হবে না। আপনাদের বিশ্বাস এক রকম, আর আমার বিশ্বাস অন্য রকম। আমি যা ভাল বুঝেছি, তা-ই ওকে করতে বলেছি।"

দারোগাবাবু বললেন, "তা বলে একটা কিছু কারণ তো থাকবে! চতুর্দিকে খুঁজে দেখা হয়েছে, ওর ভাইকে পাওয়া যায়নি। আর এখানে বসে বসে চেঁচিয়ে ডাকলেই তার সন্ধান পাওয়া যাবে? আমার মাথাটা গুলিয়ে দিচ্ছেন কেন সাধুবাবাজি? পরিষ্কার করে বলুন, খোলসা করে বলুন!"

"চেঁচিয়ে ডাকাটা আসল ছিল না। আসল ছিল খুব একমনে ওর ভাইয়ের কথা চিন্তা করা।"

"তাতেই বা কী হয়?"

"তাতে অনেক সময় দূরের জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। সবাই পারে না, কেউ-কেউ পারে। তাই দেখছিলাম, এই মেয়েটি পারে কি না!"

"ঘরে বসে বুঝি চিন্তা করা যায় না? তার জন্য বৃষ্টি ভিজতে হবে? বজ্র-বিদ্যুৎ মাথায় করে বসে থাকতে হবে?"

"এটাও তো একটা পরীক্ষা! ও যদি ভাইকে সত্যি ভালবাসে, তা হলে বজ্র-বিদ্যুতে ভয় পাবে কেন? বৃষ্টি ভিজতেও অরাজি হবে না। অন্য কোনও কথাই তো আর ওর মনে আসবে না। তা ছাড়া, আর-একটাও কারণ ছিল। ওকে পাঠালুম বলেই বৃষ্টি এত তাড়াতাড়ি থেমে গেল।"

"অ্যাঁ? ওর জন্য?"

"বজ্র-বিদ্যুতেরও তো মায়া-দয়া আছে। ওইটুকু মেয়েকে তারা কষ্ট দেবে কেন?"

"আবার মাথাটা গুলিয়ে দিচ্ছেন? বজ্র-বিদ্যুৎ কি মানুষ যে, তাদের মায়া-দয়া থাকবে?"

"মানুষ ছাড়া, আর কারুর বুঝি মায়া-দয়া নেই? পশুর নেই? গাছের নেই? তেমনি আলো, হাওয়া, রোদ, অন্ধকার, বৃষ্টি—এদেরও আছে। যাই হোক, ওই মেয়েটি যদি বজ্রের আওয়াজ শুনে ভয়ে পালিয়ে আসত, তা হলে আমি আর-একটা পরীক্ষা করতুম।"

"কী?"

"আগুন জ্বেলে তার ওপর ওর একটা হাত রাখতে বলতুম। তারপর বলতুম, ওর ভাইয়ের কথা চিন্তা করতে।"

"সেটা আমি মোটেই অ্যালাও করতুম না! আমার চোখের সামনে ওইসব ডেঞ্জারাস কাজ, অসম্ভব! বৃষ্টি তবু এক কথা, তা বলে আগুনে হাত পোড়ানো!"

খয়েরলাল ঘাড় নাড়তে-নাড়তে বলল, "এবারে অনেকটা বুঝতে পারছি।"

দারোগাবাবু তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, "তুমি কিছুই বোঝোনি। চুপ করে থাকো! যে-জন্য এখানে আসা, তার তো কিছুই সুরাহা হল না। দিপু গেল কোথায়? তার জ্যাঠাই বা গেল কোথায়?"

সাধুবাবা বললেন, "ওই মেয়েটির জ্ঞান ফিরুক। হয়তো ওর কাছ থেকেই জানতে পারবেন।"

(ক্রমশ)

পৃথিবীর সর্বপ্রথম কার্যকর বাষ্পীয় পোত জলে ভাসে আমেরিকার ডেলাওয়ার নদীতে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু (বিশ্বাস করবে?) বাষ্পশক্তি দিয়ে জাহাজ চালানোর সম্ভাবনার কথা প্রথম মানুষের মাথায় আসে তার ১৭৪০ বছর আগে। প্রাচীন কালের প্রধান বন্দর আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী এক বিজ্ঞানী হিরো ৫০ খ্রিস্টাব্দে বাষ্পীয় জাহাজের কথা প্রথম ভেবেছিলেন।

কর্নেল স্পঞ্জ বলছি ... কী, ওরা পালিয়েছে ? ... অসম্ভব !
অপেরার দিকে গিয়েছে ? ...এলাকাটা ঘিরে রেখেছ ? ... ঠিক আছে, এখানকার কাজ শেষ করেই আমি ওদিকে যাচ্ছি ।
এক ঘণ্টা বাদে ... জোহোদ অপেরায় ...
ক্যাপ্টেন ! ... ওঠো ! এখন ইন্টারভ্যাল! ... ক্যাপ্টেন! ...
এটাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা ! ভিড়ের মধ্যেই ...
সবচেয়ে নির্ভয়ে লুকিয়ে থাকা যায় !
আরে, পুলিশের বড়কর্তা !
কর্নেল স্পঞ্জ !
এই স্পঞ্জের উপরেই নির্ভর করছে ক্যালকুলাসের ভাগ্য !
রি রি রি রি রি রি রিং
ইন্টারভ্যাল শেষ! পালাব?
না । শো শেষ হলে ভিড়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব ।
এক ঘণ্টা বাদে ...
গেটে পুলিশ গিজগিজ করছে । স্টেজের দিক দিয়ে বেরোনো যাক।

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে একটা উটকো লোক জানায় যে, হরিবাবুর স্বর্গত পিতা শিবু হালদার তাকে পাঠিয়েছেন। একটা চাবি দিয়ে সে বলে, "ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ !" সে নাকি বিজ্ঞানী শিবুবাবুর শাকরেদ ছিল, সূক্ষ্ম পিস্তলের সাহায্যে শিবুবাবুকে সে তিন-তিনটে কালাসাহেবকে খুন করতে দেখেছে। তাঁর তৈরি আকাশী জামা পরে শূন্যে ঘোরা যেত। শেষ পর্যন্ত তিনি ওলন্দাজের হাতে মারা যান। হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া গজ-পালোয়ানের কাছে কুস্তি শেখে, আর-এক ভাই জরিবাবু কালোয়াতি গান করেন। দুজনের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে পঞ্চানন্দের। তারপর ···

জরিবাবু ক্ষীণ গলায় বললেন, "তাহলে উপায় ?"

"কিসের উপায় খুঁজছেন খোলসা করে বলে ফেলুন, উপায় বাতলে দেব। পঞ্চানন্দ থাকতে উপায়ের অভাব কী ? আপনার বাবাকেও কত উপায় বাতলে দিয়েছি। পাগল-ছাগল মানুষ, কখন কী করে বসেন তার ঠিক নেই। মাঝে-মাঝে বিপাকেও পড়ে যেতেন খুব। একবার তো কী একটা ওষুধ বানিয়ে খেয়ে বসেছিলেন। আমি তাঁর জাদুঘরের বারান্দায় শুয়ে আছি। নিশুত রাত্রি। হঠাৎ 'হাউরে মাউরে' চেঁচানি শুনে কাঁচা ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসেছি। তারপর দৃশ্য দেখে চোখ চড়কগাছে। কী দেখলাম জানেন ? সামনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটা লোক।"

জরিবাবু হাঁ করে শুনছিলেন, এবার নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলে বললেন, "লোক ! যাক বাবা, আমি ভাবলাম বুঝি···"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "উহুঁ, অত নিশ্চিন্ত হবেন না। লোক বলেছি বলেই কি আর লোক। এমন লোক কখনও দেখেছেন যার মুণ্ডু নেই, হাত নেই, পা নেই, চোখ চুল নখ কিছু নেই, তবু লোকটা আছে ?"

"আজ্ঞে না।"

"মাঝরাতে আমি উঠে যাকে দেখলাম তারও ওই অবস্থা। তার গলার স্বর শুনছি, ধুতি-পাঞ্জাবি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু লোকটা গায়েব। কিছুক্ষণ, মশাই, আমার হাতেপায়ে সাড় ছিল না। তারপর গলার স্বর শুনে আর পাঞ্জাবির বুকপকেটের ছেঁড়াটা দেখে বুঝতে পারলাম যে, অদৃশ্য লোকটা আসলে শিববাবু, আপনার স্বর্গত পিতামশাই।"

"বলেন কী ?"

"যা বলছি স্রেফ শুনে যান। বিশ্বাস না করলেও চলবে। তবে কিনা ঘটনাটা নির্জলা সত্যি। শিবুবাবু তো আমার হাত জাপটে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'ওরে পঞ্চু, তুই না বাঁচালে আর আমার রক্ষে নেই। সলিউশন এ এম ফর্টি খেয়ে এই দ্যাখ আমার অবস্থা। স্রেফ গায়েব হয়ে গেছি, আয়নায় ছায়া পড়ছে না, নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। একটু খুঁজে দে বাবা। ওরে, আমি আছি তো !"

"বটে !"

"তবে আর বলছি কী ? আমি ঠাহর করে করে বাবুর মাথাটা খুঁজে হাত বুলিয়ে বললাম, 'অত চেঁচামেচি করবেন না। লোক জড়ো হয়ে যাবে। ঠাণ্ডা হয়ে বসুন, আমার মাথায় ফন্দি এসে গেছে।' তারপর কী করলাম জানেন ?"

"কী করলেন ?"

"বলছি, তার আগে বেশ ভাল করে একটা পান খাওয়ান দেখি। কালোয়াতরা শুনেছি গলা সজুত রাখতে পান আর জর্দা খায়। তা আপনার বেশ ভাল জর্দা আছে তো ?"

জরিবাবু এবার অনেকটা স্বাভাবিক গলায় বললেন, "আছে।"

"লাগান একখানা জম্পেশ করে।"

জরিবাবুর হাত এখনও কাঁপছে। তবু পেতলের বাটা থেকে এক খিলি সাজা পান আর জর্দা পঞ্চানন্দকে দিয়ে নিজেও এক খিলি খেলেন। বললেন, "তারপর ?"

পঞ্চানন্দ জরিবাবুর পিতলের পিকদানিতে পিক ফেলে কিছুক্ষণ আরামে চোখ বুজে পানটা চিবিয়ে নিমীলিত চোখে বলল, "ফন্দিটা এমন কিছু নয়। ওর চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধি আমাকে খেলাতে হয়। করলাম কি, সেই রাতের মতো শিবুবাবুকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে পরদিন সকালেই বাজারে গিয়ে খানিকটা তেলরং কিনে আনলাম। তারপর শিবুবাবুর হাতে-পায়ে-মুখে খুব যত্ন করে রং লাগাতেই ফের আসল মানুষটা ফুটে উঠল। বলতে নেই, আপনার বাবামশাই বেশ কালোই ছিলেন। আমি এক পোঁচ ফর্সা করে দিলাম। একটা মুশকিল হল, চোখে তো আর রং লাগাতে পারি না। তাই একজোড়া পরকলা পরিয়ে দিতে হল। দিব্যি দেখাত। তাই বলছিলাম, পঞ্চানন্দ থাকতে উপায়ের অভাব ?"

জরিবাবু হাঁ করে শুনতে শুনতে জর্দাসুদ্ধ পিক গিলে ফেলে হেঁচকি তুলতে তুলতে বললেন, "বাবাকে রং করলেন ?"

"তবে আর বলছি কী ? কেন, টের পাননি আপনারা ? শিবুবাবুর গায়ের রংটা ছিল আদতে তেলরং।"

"আর কখনও ওরিজিন্যাল চামড়া ফুটে ওঠেনি ?"

"তাই ওঠে ? সলিউশন এ এম ফর্টি বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস। তবে উপকারও হত। একবার রহিম শেখ পড়ল একটা মিথ্যে খুনের মামলায়। লোকটা ভাল, সাতচড়ে রা নেই। তবু কপাল খারাপ। এসে শিবুবাবুর হাত জাপটে ধরল, 'শিবু,বাঁচাও।' তখন শিবুবাবুর অগতির গতি ছিলাম আমি। উনি এসে আমাকে বললেন, 'রহিম আমার ছেলেবেলার বন্ধু রে পঞ্চু, একটা উপায় কর'। আমি তখন দিলাম সলিউশন এ এম ফর্টি এক চামচ ঠেসে। রহিম শেখ গায়েব হয়ে গেল। দিব্যি খায় দায়, ফুর্তি করে বেড়ায়, পুলিশের নাকের ডগা দিয়েই ঘোরে, পুলিশ রহিম শেখকে খুঁজে-খুঁজে ওদিকে নাচার হয়ে পড়ে। সে ভারী মজার ঘটনা। তা এ-রকম আরও

কিছু-কিছু লোককে আমরা গায়েব করে দিয়েছিলাম বটে। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ এখনও আছে। কখনও অশরীরী গলার আওয়াজ পান না ?"

· জরিবাবু আঁতকে উঠলেন। তারপর চারপাশটা সন্দিগ্ধ চোখে একটু দেখে নিয়ে বললেন, "ঠিক মনে পড়ছে না।"

"একটু চেপে মনে করার চেষ্টা করুন। এখনও দু'চারজন ঘোরাফেরা করে। একটু আগে আপনার ঘরে ঢোকার মুখেই কার সঙ্গে যেন একটা ধাক্কা লাগল। ব্যাটাকে ধরতে পারলাম না। আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল। তবে আছে তারা।"

"ওরে বাবা ! ধাক্কাও দেয় ?"

পঞ্চানন্দ খুব হাসল। পানের পিক ফেলে বলল, "ধাক্কা তো ভাল জিনিস। ইচ্ছে করলে কত কী করতে পারে। আপনাকে পছন্দ হল না তো গলাটাই রাত্তিরে নামিয়ে দিয়ে গেল, কি তানপুরার তারগুলো ছিঁড়ে তবলা ফাঁসিয়ে রেখে গেল। কেউ তো আর তাদের ধরতে পারছে না।"

"তাহলে কী হবে ?"

"এর জন্য আপনার বাবাই দায়ী। ওষুধটা পরীক্ষা করতে যাকে-তাকে ধরে এনে খাইয়ে দিতেন। লোকগুলো ভাল কি মন্দ তা খুঁজে দেখতেন না। তাই রহিম শেখের মতো ভাল লোকও যেমন আছে তেমনি কালু-গুণ্ডা, নিতাই-খুনে, জগা-চোরেরও অভাব নেই। কখন যে কী করে বসে তারা !"

"ওরে বাবা !"

"তবে আপনি ভয় পাবেন না। পঞ্চানন্দ তো আর ঘোড়ার ঘাস কাটে না। তার কাছেও জরিবুটি আছে। শিবুবাবু আমাকে একটা দোরঙা কাচের চশমা দিয়ে গেছেন। পাঁচজনের হাতে দেওয়া বারণ। তবে সেই চশমা চোখে দিলেই আমি অদৃশ্য লোকগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পাই। আমি থাকতে চিন্তা নেই।"

"আপনি থাকবেন তো ?"

"দেখি ক'দিন থাকতে পারি। হিমালয়ও বড় ডাকছে। দেখি কতদিন মনটাকে বেঁধে রাখতে পারি।"

জরিবাবু পানের বাটাটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আর একটা পান ইচ্ছে করুন।"

"করলাম। আহা বেশ পান। সেই কাশীতে থাকতে একবার রাজা ললিতমোহন খাইয়েছিল। বড় মিঠে আর মোলায়েম পাতা।"

"আমি আপনাকে রোজ খাওয়াব।"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "সে হবে'খন। তা ইদিকে শীতটাও পড়েছে এবার জেঁকে, ইয়ে, আপনার বেশ নরম কম্বল-টম্বল নেই ? একখানা ধার পেলে হত।"

"হ্যাঁ আছে। নেবেন ?"

"ধার হিসেবে। জাদুঘরের বারান্দাতেই তো শুতে হবে রাতে। ঠাণ্ডা লাগবে।"

জরিবাবু শশব্যস্তে বলেন, "তা কেন, আমার পাশের ঘরখানাই এমনি পড়ে থাকে। আপনি বাবার বন্ধু, থাকবেন সে তো সৌভাগ্য আমাদের। তবে আপনার কথায় মনে পড়ল, কিছুদিন আগে সন্ধেবেলায় পিছনের উঠোনে ঘুরে ঘুরে একটু সুর তৈরি করার সময় হঠাৎ যেন আমার গায়েও কে একটু আলতো করে ধাক্কা মেরেছিল।"

"অ্যাঁ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তখন মনে হয়েছিল মনের ভুল। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা তা নয়। আরও কথা আছে..."

"অ্যাঁ ! কী সর্বনাশ !"

"সেদিন সকালে রেওয়াজের সময় কিছুতেই রেখাবটা লাগাতে পারছিলাম না। হঠাৎ কানের কাছে কে যেন গলা খেলিয়ে সুরটা ধরিয়ে দিল। তখন মনে হয়েছিল, গলাটা বোধহয় খৈয়াম খাঁয়ের। তা যে নয়, এখন বুঝতে পারছি। আমার বাবা কি কোনও গায়ককে অদৃশ্য করে দিয়েছিলেন ?"

পঞ্চানন্দ জর্দাসুদ্ধু পানের পিক গিলে ফেলে হেঁচকি তুলতে লাগল। জবাব দিতে পারল না। (ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

Amela-5 (20.3.85)

রোভার্সের রয়
ক্লাব-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে মাঠে নেমেছে রয়। কিন্তু সে পুরোপুরি সুস্থ নয়। ওয়ালফোর্ডের সবাই তা টেরও পেয়েছে···
রয়ের অবস্থা দেখেছ ? চোট সারেনি !
মাইক তাই সহজেই বল কেড়ে নিল !
অ্যাকশন-রিপ্লে দেখেও বোঝা যাচ্ছে, রয় ডান পায়ে বল টানতে চাইছিল···
মাইক তা বুঝতে পেরে সহজেই তাকে আটকে দেয়···
স্যাম বার্লো খাপ্পা !
ওর বাঁ পা এখনও সারেনি !
সবাই তা টের পেয়েছে
খেলতে নামা ঠিক হয়নি !
স্যাম বার্লোর রাগ কমছে না···
এ-খেলায় হারলে লিগ হাতছাড়া হবেই !
তখন ওকে মজা টের পাওয়াব !
দলে আজ মার্ভিন আর ভার্নন নেই !
বদলি খেলোয়াড় স্টার্কি অবশ্য ভাল খেলছে !
বদ্‌লি-খেলোয়াড় রজারও চমৎকার হেড করল !
ব্ল্যাকির পায়ে বল পাঠিয়েছে !
ব্ল্যাকি বল দিল রয়কে···
রয়কে আটকাও !
ভয় নেই ! রয়ের বাঁ পা তো অচল !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

আপনার সোনাটির কোমল ত্বকে, আপনার স্নেহ-মধুর চুম্বনের মতই দেয় এ এঁকে!

জনসন্স বেবী সোপ, ছোট্ট সোনাদের ছোট্ট দুনিয়ার নানান 'স্পেশাল' জিনিষের মধ্যে এটিরও একটি স্থান রয়েছে।

জনসন্স বেবী সোপ-এ ল্যানোলিন মেশানো থাকে ব'লে, এর পরশটি হয়ে ওঠে মায়ের মমতাভরা মৃদু-কোমল পরশের মতই। আর, এর কোমল-মধুর সুবাস, সারা অঙ্গে ঘিরে থেকে, সোনাটিকে মাতিয়ে রাখে শিশুসুলভ আনন্দের ধারায়।

জনসন্স বেবী সোপ
বিশুদ্ধ...মৃদু...নিরাপদ

Johnson & Johnson

© J&J

OBM/2193-BEN

'অ্যাডভেঞ্চার গ্যালি'তে অবাধ্য কামান-চালক উইলিয়াম মুরের মাথায় কাঠের গামলা ছুঁড়ে মেরেছে ক্যাপ্টেন কিড। পরদিনই মুর মারা যায়।(ডাইনে : জলদস্যুদের জাহাজ। পতাকায় আঁকা থাকত খুলির ছবি।)

জলদস্যু ক্যাপ্টেন কিড

রবীন্দ্রনাথ ঘোষাল

ব্রিটিশ জলদস্যু ক্যাপ্টেন কিডের নাম কে না জানে? ক্যাপ্টেন উইলিয়াম কিড ছিল এমন মানুষ, যাকে নিয়ে গল্প, জল্পনা আর কৌতূহলের অন্ত নেই। ভয়ানক যে-সব জলদস্যু অখ্যাতির শিখরচূড়ায় উঠেছিল, কিডের প্রসিদ্ধি তাদের মধ্যে অদ্বিতীয়।

অথচ, সত্যিকারের কৃতিত্বের মাপকাঠিতে কিন্তু কিড ছিল মাঝারি, সাধারণ পর্যায়ের জলদস্যু। আসলে, রবার্ট লুই স্টিভেনসন, হ্যারিয়েট বিচার স্টো ইত্যাদি সব লেখকের উর্বর কল্পনাশক্তিই তাকে এক অতিমানব হিসেবে দাঁড় করায়, এবং তার চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী জলদস্যুদের 'কৃতিত্বের খ্যাতি' আরোপিত হয় তার উপরে। শেষটায় কিড শিকার হয়েছিল তার এই অনুপার্জিত খ্যাতির। তার দুর্ভাগ্যও সেজন্যে খানিকটা দায়ী। তা ছাড়া ছিল রাজনৈতিক জোট। সেই জোটের কাছে হেরে গিয়ে তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়েছিল।

প্রথম জীবনে কিড ছিল খুবই ভাগ্যবান। স্কটল্যাণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার জন্ম। সুশিক্ষার সুযোগ এবং সুস্থ পারিবারিক জীবনের স্বাদও সে পেয়েছিল। যৌবনে সে সমুদ্রের হাতছানিতে ব্যাকুল হয়ে নাবিকের কাজে যোগ দেয়। তারপর কাজে দক্ষতা দেখিয়ে উন্নীত হয় জাহাজের অধ্যক্ষের পদে। নিজের বেসরকারি ব্রিটিশ রণতরীর কাপ্তেন হিসেবে ফরাসি জাহাজের ওপর পর্যায়ক্রমে সফল আক্রমণ চালায় পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের এলাকায়। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, জলদস্যুবৃত্তির কাজে তখনই তার হাতেখড়ি হয়েছিল।

১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে কিড নিউ ইয়র্কে বসবাস আরম্ভ করে। সেখানে সে এক ধনী বিধবাকে বিয়ে করে। সুন্দর বাড়ি এবং সম্পত্তির মালিক হয়। তার জীবন তখন সচ্ছল। বন্ধুবান্ধবরাও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি। সেই বছরেই ম্যাসাচুসেট্স্ রাজ্যের সনদ নিয়ে সে নিউ ইংল্যাণ্ডের উপকূলে এক শত্রুপক্ষীয় জাহাজকে ধ্বংস করে দেয়। পরের বছর কিড ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পরিক্রমা আরম্ভ করে। একটি ফরাসি জাহাজকে পর্যুদস্ত করার পরে অ্যান্টিগুয়াতে নামে। সেখানে তার নিজের জাহাজ বেদখল হয়ে যায়। মাদাগাস্কারের নামকরা জলদস্যু "কাপ্তেন" কুলিফোর্ড কিডের জাহাজটি দখল করে সরে পড়ে। পরে অবশ্য কিডের সঙ্গে কুলিফোর্ডের খুব বন্ধুত্ব জমে গিয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, নিউ ইয়র্ক শহরের বহু নামজাদা পরিবারই জলদস্যুদের লুঠের মালের ব্যবসা করে প্রচুর পয়সাকড়ি করেছিল। নিউ ইয়র্কের শাসক এই দুর্নীতি বন্ধ করার কোনও চেষ্টাই করেননি। আসলে গভর্নর বেঞ্জামিন ফ্লেচার নিজেই নাকি লুঠের মালের এই কালোবাজারির জন্যে দায়ী। তিনি ছিলেন সুদখোর। কালোবাজারিদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে তিনি নিজেও লাল হয়ে গিয়েছিলেন।

সেকালে লোহিতসাগর এবং ভারত মহাসাগরে ইংরেজদের

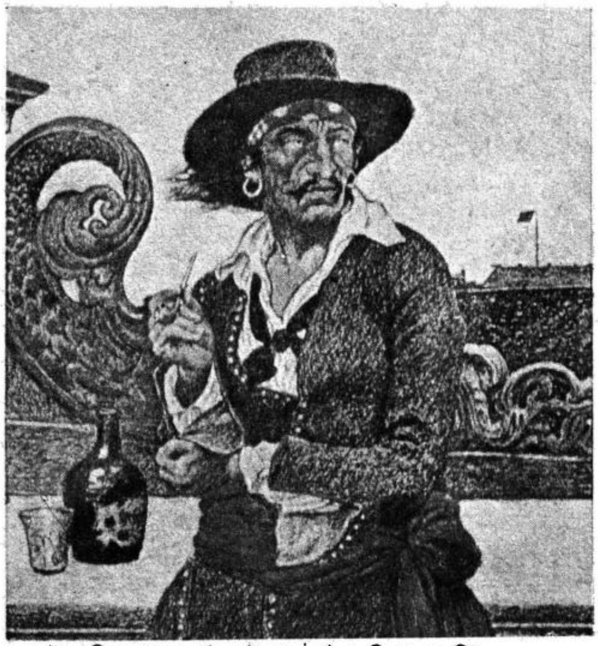

ক্যাপ্টেন কিড (হাওয়ার্ড পাইলের আঁকা বিখ্যাত ছবি)

জাহাজ বারে-বারে লুঠ করা হচ্ছে বলে খবর রটে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং অন্যান্য শক্তিশালী বাণিজ্য গোষ্ঠী ইংল্যাণ্ডের রাজশক্তির কাছে দাবি জানায়, জলদস্যুদের দমন করতে হবে। নইলে ব্যবসা চালানো যাবে না। ইংল্যাণ্ডের রাজা বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিউ ইয়র্কের গভর্নর ফ্লেচারকে পদচ্যুত করে বেলমণ্টের আর্ল রিচার্ড কুট্‌কে শাসকপদে নিযুক্ত করে আদেশ দেন যে, নিউ ইংল্যাণ্ডকে যেন জলদস্যুদের প্রভাবমুক্ত করা হয়। বেলমণ্ট সঙ্গে-সঙ্গে রাজাকে বলেন যে, জলদস্যুদমনের জন্য কিডকে যেন মাদাগাস্কারে পাঠানো হয়। ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর তারিখে রাজা উইলিয়ামের কাছ থেকে কিড তার নিয়োগপত্র পেল।

কিডের জাহাজটি ছিল এক বেসরকারি রণতরী। বেসরকারি রণপোত পরিচালনার সনদটা ছিল এই রকম যে, জয় করে নেওয়া মালের এক-দশমাংশ রাজাকে দিতে হবে, আর বাকিটা থাকবে কাপ্তানের। কিডের ছিল দুটি আলাদা সনদ। সাধারণ সনদটিতে কিডকে অধিকার দেওয়া হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের শত্রু বলে পরিগণিত বিদেশী জাহাজগুলিকে দখল করে নেওয়ার। অন্যটিতে ছিল যাত্রাপথে নামকরা জলদস্যুদের গ্রেপ্তার অথবা হত্যা করবার অধিকার। এই যাত্রায় যে-সব জলদস্যু কিডের শিকার হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল টমাস টিউ, জন আয়ার্ল্যাণ্ড, টমাস ওয়ের আর উইলিয়াম মেজ্।

এই অভিযানের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল "অ্যাডভেঞ্চার গ্যালি" নামে ২৮৪ টনের ৩৪টি কামান লাগানো একটি সুন্দর নতুন জাহাজ। ক্যাপ্টেন কিড নিজে খুব নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ একদল নাবিক এ-কাজের জন্য বেছে নিয়েছিল। কিন্তু এই সব নাবিকের মধ্যে কিছু লোককে রাজকীয় নৌবহরে তুলে নেওয়া হয়। ফলে কিডকে বাধ্য হয়ে ডক এলাকার আড্ডা থেকে কিছু বাজে লোককে বদলি হিসেবে নিয়োগ করতে হয়েছিল। সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ করে কিড প্রথমেই নিউ ইয়র্কে পৌঁছল, এবং কিছু অতিরিক্ত নাবিক সংগ্রহ করে ওর অভিযানের আসল প্রস্তুতির ব্যবস্থা করল। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই কিড তৈরি হল তার অভিযানের জন্য। এই যাত্রাই তার জীবনের সবচেয়ে অভিশপ্ত যাত্রা।

মাদাগাস্কারের পথে পাল তুলে রওনা হবার কিছুদিনের মধ্যেই কিডের ভাগ্যদেবতা বিরূপ হলেন। একে তো নাবিকদের মধ্যে অনেকে অবাধ্য, তাদের সামলে রাখাই অতি শক্ত কাজ, তার উপরে আবার এক-তৃতীয়াংশ নাবিক মারা পড়ল কলেরায়। এর উপরে এল আর-এক বিপদ, জাহাজটিতে জল ঢুকতে আরম্ভ করল। কিড কোনোমতে মাদাগাস্কারে এসে পৌঁছল, এবং জানতে পারল যে, জলদস্যুদের বেশির ভাগ জাহাজই তখন সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছে। দেরি না করে কিড পাড়ি দিল ভারতের মালাবার উপকূলের দিকে।

পথে দেখা গেল, বেশ কিছু জাহাজ মূল্যবান নানা ভারতীয় পণ্য নিয়ে নানা জায়গায় পাড়ি দিচ্ছে। কিড সে-সব জাহাজকে আক্রমণ না-করায় তার নাবিকদের মধ্যে দেখা দিল অসন্তোষ। কিছু নাবিক তো কিডের জাহাজ ছেড়ে সাঁতরে ফিরে গেল মাদাগাস্কারে। কিন্তু বাদবাকি নাবিক ক্রমে আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে লাগল। ভেঙে পড়তে লাগল সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা। যখন কড়া হাতে শাসন করাই ছিল একমাত্র ব্যবস্থা, কিড তখন কিন্তু ভীরুর মতন হাত গুটিয়ে বসে রইল। অবস্থা একদিন চরমে উঠল। জাহাজের নাবিকদের একটি দলের নেতা, কামান-চালক উইলিয়াম মুর, কিডের মুখোমুখি হয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল যে, কাপ্তানই সব কিছু ভণ্ডুল করে দিচ্ছে, এবং নিজেকে এই জাহাজের অধ্যক্ষ হিসেবে অযোগ্য

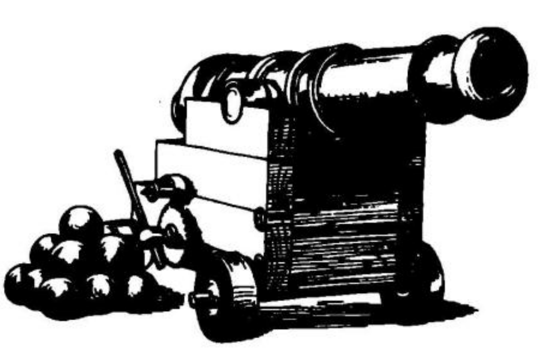

জলদস্যুরা যে কামান ব্যবহার করত

বলে প্রমাণিত করছে। ক্রুদ্ধ বচসার মাঝখানে কিড একটা কাঠের গামলা টেনে নিয়ে সজোরে বসিয়ে দিল মুরের মাথায়। পরদিনই মুরের মৃত্যু হল।

অনেকের মতে, এই সময় থেকেই নাবিকদের উচ্ছৃঙ্খলতায় বিপর্যস্ত ক্যাপ্টেন কিড এক কুখ্যাত জলদস্যুতে পরিণত হয়। দেশ, জাতির বিচার না করে সে সব জাহাজই লুঠ করতে আরম্ভ করল। যারা পালিয়ে বাঁচল, তারা কিডের বিরুদ্ধে বন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী রটাতে লাগল। ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে কিড ও তার নাবিকেরা ৪০০ টনের একটি আর্মেনীয় জাহাজ 'কোয়েদাগ মার্চেন্ট'কে জয় করে নেয়। এই বিরাট জাহাজটি ফরাসি সরকারের অনুমতিপত্র নিয়ে পাড়ি দিচ্ছিল, যদিও এর কাপ্তান ছিল একজন ইংরেজ। ইংল্যাণ্ড

এবং ফ্রান্সের মধ্যে তখন যুদ্ধ চলছিল, কিড তাই দাবি করল যে, এ-জাহাজ তারই। ইংরেজ বণিকের দল এতে খেপে গিয়ে হৈ-চৈ লাগিয়ে দেয়।

জিতে নেওয়া এই জাহাজটি সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট বলে কিড এবং তার দলবল তাদের পুরনো জাহাজটি পরিত্যাগ করে এতেই এসে উঠল। তারপর সোজা পাড়ি দিয়ে মাদাগাস্কারে পৌঁছে কিড দেখা পেল তার পূর্বপরিচিত ক্যাপ্টেন কুলিফোর্ডের। আগের বারে কুলিফোর্ড কিডের জাহাজ চুরি করে নিয়েছিল। তবু কিড বন্ধুত্ব করল কুলিফোর্ডের সঙ্গে। কিন্তু তাতে লাভ হল না। কুলিফোর্ড ছিল অতি ধূর্ত লোক। কিডের বেশ-কিছু নাবিক তাই কুলিফোর্ডের দলেই ভিড়ে গেল। কিড তখন ঠিক করল, সে দেশেই ফিরে যাবে। তার নামে যে ইংল্যাণ্ডে রিপোর্ট করা হয়েছে, সে গুজব সে শুনেছিল। পশ্চিমের পথে যাত্রা করে সে হয়তো ভেবেছিল যে, জয় করে নেওয়া জাহাজগুলি থেকে সংগ্রহ করা ফরাসি সরকারের নৌবাণিজ্যের অনুমতিপত্রগুলি সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে দেখিয়ে সে নিজেকে কলঙ্কমুক্ত করতে পারবে। কিন্তু অ্যাঙ্গুইলা দ্বীপে নোঙর ফেলে সে বুঝতে পারল যে, তাকে জলদস্যু বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তক্ষুনি সে আবার পাড়ি দিল হিস্পানিয়োলাতে। পথে 'কোয়েদাগ মার্চেন্ট'কে ত্যাগ করে, বিরাট একটা সুলুপ জাহাজ কিনে তাতে তার লুঠের মাল বোঝাই করে নিউ ইংল্যাণ্ডের অভিমুখে রওনা হল। ভেলাওয়ার উপসাগরে নোঙর ফেলে, নাবিকেরা সব গোপনে উপনিবেশের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। কিড জাহাজেই রইল এবং যাকে সে বন্ধু বলে মনে করত সেই গভর্নর বেলমণ্টের কাছে নিজের কাজের সাফাই দিয়ে একটি চিঠি পাঠাল।

তাড়া-খাওয়া কিড তারপর লং আইল্যাণ্ডের অদূরে এক দ্বীপে হাজির হয়ে নিজের লুঠের মালের বড় একটা অংশ জন গার্ডিনারের হেফাজতে রাখল। তারপর উপকূল ধরে সে লুঠের বাকি মাল বেচতে বেচতে চলল। কিছুদিনের মধ্যেই সে গভর্নর বেলমণ্টের কাছ থেকে তার চিঠির উত্তর পেয়ে যায়। বেলমণ্ট এই পত্রে জানান, কিড যদি প্রমাণ করতে পারে যে, সে নির্দোষ, তাহলে সে বেলমণ্টের কাছে সব রকম সহায়তা পাবে। এই কথায় আস্থা রেখে ক্যাপ্টেন কিড বস্টন বন্দরে বেলমণ্টের পাতা ফাঁদে পা দেয়। গভর্নর বেলমণ্ট তক্ষুনি তাকে গ্রেপ্তার করে, শেকলে বেঁধে, বন্দী করে রাখল।

বেলমণ্ট এর পরে কিডের লোকজনদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করা এবং গার্ডিনার'স দ্বীপ ও অন্যান্য জায়গা থেকে কিডের গচ্ছিত লুঠের মাল উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করার কাজে

ক্যাপ্টেন কিডকে নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক বই। তারই থেকে নেওয়া হয়েছে এই ছবি দুটি

মন দিল। ফরাসি সরকারের অনুমতিপত্রগুলিও, যা ছিল কিডের সমর্থনে খুবই মূল্যবান দলিল, হাতিয়ে নিল বেলমণ্ট। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কিডকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ইংল্যাণ্ডে। সেখানে তার বিচার হবে।

কিডের গ্রেপ্তারের পর থেকেই জলদস্যুদের বিরুদ্ধে ঘৃণার অভিযান শুরু হয়ে যায় ইংল্যাণ্ডে। শক্তিশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীরাও দাবি তুললেন যে, কিডকে ফাঁসি দিতে হবে। আসল কথা হল, সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল, হুইগ্ এবং টোরিদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছিল, এবং ক্যাপ্টেন কিড পড়ে গিয়েছিল তারই আবর্তে।

কিড পারেনি বেলমণ্টের কাছ থেকে তার সপক্ষে দলিলগুলি উদ্ধার করে আনতে। এই দলিলগুলি আদায় করার জন্য কিড আরও সময় চেয়ে যে অনুরোধ করেছিল, তাও মেনে নেওয়া হয়নি। ১৭০১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কিডের বিচার হল। জলদস্যুতা এবং কামান-চালক উইলিয়াম মুরকে হত্যার অভিযোগে কিডকে দোষী সাব্যস্ত করা হল। ২৩ মে তারিখে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হল তাকে।

এভাবেই শেষ হল কুখ্যাত সেই ক্যাপ্টেন কিড। কিন্তু তার দুঃসাহসিক অভিযানের এবং কীর্তিকলাপের নানা বিবরণে সেই ভাগ্যহীন জলদস্যু যেন মানুষের মধ্যে নূতনভাবে জন্ম নিল। গল্পগাথায়, সাহিত্যে, শিল্পীদের আঁকা ছবিতে, প্রবাদ-পুরুষ ক্যাপ্টেন কিডের সমুদ্র-বিহার চলতেই থাকল। আজও তা অব্যাহত আছে।

বোর্নভিটাভরা বর্ষগুলি

যার জন্যে এরা একদিন আপনাকে জানাবে তাদের কৃতজ্ঞতা।

বাড়ন্ত বাচ্চারা, অন্য আর সব মল্টেড পানীয়ের মধ্যে বোর্নভিটা-ই কেন সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে? কেন দু'পুরুষ ধরে মা বাবারা জোরের সঙ্গেই বলেন। তাদের বাচ্চাদের অন্য কোন পানীয়তে কাজ হবে না?

এশুধু এটির মজাদার স্বাদের জন্যে নয়। এমন কি ক্যাডবেরিস্ নামটির জন্যেও নয়। এর কারণ অন্য কিছু। বিশেষ কিছু। এ হ'ল বোর্নভিটা, যে পানীয়ের গুণ বলে, তুমি বেড়ে চলো।

ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা

পালন-পোষণ সঠিকভাবে করুন,
বাচ্চাদের বোর্নভিটা খাওয়ান।

OBM/3784 BEN

আজব দেশে বাদল

অতীন্দ্র মজুমদার

ঝড় উঠেছে, দ্রিমি দ্রিমি
উডুংগাতে মাদল,
উল্‌গুল্‌গায় ঝামরে নামে
মাঘমাসেতে বাদল।
মাউন্ট কুথায় কৃষ্ণচূড়া
স্নান করে সেই জলে,
সাপের মতো এঁকেবেঁকে
সোয়ান নদী চলে।
গিব্‌সনের ওই মরুভূমি
জল পেয়ে গান ধরে,
কাল্‌গুরলি ভিজিয়ে ধূলি
নাচছে যে প্রাণ ভরে।
অ্যাল্‌বেনিতে লাফিয়ে ওঠে
তিমিমাছের খোকা,
ওংগারাটা গুটিয়ে নিল
জল-ঝরা ঝরোকা।
নামগুলি সব লাগছে আজব
পাহাড় এবং নদীS,
ভূগোল-বইটা উল্টে দেখলে
পাবে এদের হদিস।

ছবি : দেবাশিস দেব

ভালবাসে সব্বাই

সুভাষপ্রসন্ন ঘোষ

যখন সকালে আমি ইস্কুলে যাই
ঝিক্‌মিক্ শিশিরের ফোঁটা থাকে ঘাসে।
কিচিমিচি পাখিদের ডাক শুনি তাই
আমাকে সবাই ওরা কত ভালবাসে।
বারোটায় আমি ঠিক বাড়ি ফিরে আসি,
তখন সুয্যিমামা আকাশের মাঝে।
স্নান সেরে মা'র সাথে বসে পাশাপাশি–
খাওয়া সারি, ঘড়িটাতে প্রায় দুটো বাজে।

বিকেলে খেলতে যাই বন্ধুর সাথে,
পার্কের বাগানটা ভারী ভাল্লাগে।
হুটোপুটি ছুটোছুটি করি মাঠটাতে !
বাড়ি ফিরে আসি ঠিক সন্ধ্যার আগে।
বাড়ি এসে চুপচাপ বই-খাতা নিয়ে
পড়াটা করব শেষ খুব তাড়াতাড়ি।
অঙ্কটা বাবা রোজ দেবেন বুঝিয়ে।
তখন আমার কেন ঘুম পায় ভারী ?

রাত্তিরে খাওয়া শেষ হলে শুতে যাই,
আকাশে তখন চাঁদ, কত তারা হাসে।
মা'র পাশে শুয়ে-শুয়ে ভাবি এ-কথাই—
চাঁদ, তারা আমাকে কি কম ভালবাসে ?

হিন্দি গল্প

কবির ঘরে চোর

গোবিন্দ মিশ্র

বিহারের এক ছোট্ট গ্রামে এক কবি থাকতেন। কবি হিসেবে সমাজের কাছ থেকে তাঁর যেটুকু সম্মান পাওয়া উচিত ছিল, তা তিনি কখনও পাননি। অনেকে তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, এমনকী অবজ্ঞাও করেছে। কিন্তু তিনি এসব নিয়ে মাথা ঘামাননি। তিনি তাঁর কাজ মনপ্রাণ দিয়ে করেছেন, কবিতা লেখা ছেড়ে দেননি। তাঁর ধারণা ছিল, কবিতা লেখা অত্যন্ত পবিত্র কাজ। কবিতা মানুষকে সৎ আর সুন্দর করে।

কবি পেশায় ছিলেন শিক্ষক। চাকরি-জীবন শেষ হওয়ার পর কবির একমাত্র ছেলে তাঁর বাবা-মা'কে শহরে নিয়ে যেতে চাইলেন। কবি রাজি হলেন না। বললেন, "না, তা হয় না। যে-গ্রামে জীবনের এতগুলো বছর কেটে গেল, সেখান থেকে এক পা-ও নড়ব না। যত কষ্ট হয় হোক, আমি এখানেই থাকব। তোমার মা যদি যেতে চান, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি বাধা দেব না।"

কবির স্ত্রী কবির কথা শুনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন, "সারাজীবন তো সংসারের ঘানি টানলাম। বুড়ো বয়েসে ছেলে-বউয়ের কাছে দুটো দিন যে বিশ্রাম নেব, তা হবার নয়। ঠিক আছে বাপু, তুমি যা ভাল মনে করছ, করো।"

শেষপর্যন্ত ঠিক হল, কবি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামেই থাকবেন, শহরে যাবেন না। গ্রামের শেষে কবির বাড়ি। বাড়ি বলতে একফালি জমির উপর ছোট্ট দুটি ঘর, আর তার মাথার ওপর একটি ছাদ। দুটি প্রাণীর জন্যে এই যথেষ্ট।

একবার পাড়ায় এক বিয়েবাড়িতে দু'জনে নেমন্তন্ন খেতে গেছেন। ফিরতে-ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। তালা খুলে কবি ঘরের ভেতর ঢুকতে গিয়ে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। কেউ যেন দৌড়ে ছাদের ওপর গেল। আলো জ্বালতেই একটা 'ধুপ' করে শব্দ। নিশ্চয়ই কেউ ছাদ থেকে নীচে লাফ দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। কবির বিছানাটি নিয়ে কেউ পালিয়েছে। বাড়িতে তো দামি জিনিসপত্র কিছু ছিল না। লেপ, তোশক, কম্বল, চোর এগুলোই নিয়ে পালিয়েছে। লেপটা এই শীতেই তিনি বানিয়েছিলেন। কবি দরজা খুলে বাইরে উঁকিঝুঁকি মারলেন, কাউকে দেখতে পেলেন না। কনকনে শীতের রাত্রি, টুপটুপ্ করে শিশির পড়ছে। কোথাও জনমানব জেগে নেই।

কবির মন বিষণ্ণতায় ভরে গেল। সম্বল বলতে ছিল একটা বিছানা, তাও গেল। কবির স্ত্রী চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন, "এক্ষুনি পুলিশে খবর দাও। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কী হবে?"

কবি কোনও কথা বললেন না। স্ত্রীর কথাকেও তেমন গুরুত্ব দিলেন না। দুঃখের মধ্যেও তিনি হেসে ফেললেন। তারপর স্ত্রীকে বললেন, "দ্যাখো, আমাদের শীতের বিছানা যে চুরি করেছে, সে একেবারেই বোকালোক। বোকা না হলে কেউ কখনও এই গরিব কবির বাড়িতে ঢোকে! আমি যে এই বাড়িতে কীভাবে থাকি, কত কষ্ট করে সংসার চালাই, আমাদের বাড়িতে চুরি করবার মতো কোনও দামি জিনিস যে নেই, এ তো সব্বাই জানে। এই লোকটা সত্যিই খুব আনাড়ি, একটুও বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। যাক্‌গে, নিয়ে যখন গেছে, কী আর করা!"

কবি পুলিশে খবর তো দিলেনই না, এমনকী তাঁর বাড়িতে যে চুরি হয়েছে এ-কথা কাকপক্ষীও জানতে পারল না। তিনি অনেক ভেবেচিন্তে একটি চমৎকার উপায় বার করলেন। রাত্রি হতে-না-হতেই খাওয়া-দাওয়া সেরে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন। পাড়ার একটি খুব বিশ্বাসী ছেলে শ্যামুকে কবি বলে রেখেছিলেন, সে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে যাবে, যাতে মনে হয় বাড়িতে লোকজন নেই। একটি রেকাবিতে কয়েকটি পানের খিলি সাজিয়ে রাখলেন। স্ত্রীকে বললেন, "রাত্রে একটি কথাও বোলো না। যা বলবার দিনের বেলা বোলো। কারণ জানতে চেয়ো না, সব পরে বলব।"

এইভাবে পাঁচ-ছ'দিন কেটে গেল। একদিন গভীর রাত্রে দরজায় খুট্‌খুট্ শব্দ। কবি স্ত্রীকে চুপ করে থাকতে ইশারা করে

কাঠ হয়ে শুয়ে রইলেন। আস্তে-আস্তে একটি দরজা খুলে গেল। চুপিচুপি ভিতরে ঢুকে পড়ল একটি ছায়ামূর্তি। কবি যেভাবে শুয়ে ছিলেন, সেইভাবেই শুয়ে রইলেন। তারপর বেশ মৃদু গলায় আদরের সুরে ছায়ামূর্তিকে উদ্দেশ করে বললেন, "আরে আপনি! কী সৌভাগ্য আমার। আসুন, আসুন। এতক্ষণ আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম। কোনও হৈ-চৈ করবেন না। আপনার যা ইচ্ছে নিয়ে যান। বলেন তো আলোও জ্বেলে দিতে পারি।"

কবি বিছানা থেকে উঠে এসে আলো জ্বেলে দিলেন। তারপর লোকটির কাঁধে হাত রেখে বললেন, "কী খবর ভাই তোমার? বোসো, বোসো। পান খাও।"

মুখ নিচু করে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ময়লা তেলচিটে ধুতি, আর গেঞ্জি। খড়ি-ওঠা হাত-পা, মুখভর্তি দাড়িগোঁফ। সর্বাঙ্গে অভাব আর কষ্টের ছাপ। মুখ তুলে তাকাতে পারছে না লোকটি। কবি বললেন, "আরে, এতে লজ্জার কী আছে? যা আছে আমার সংসারে, সবই তো তোমার ভাই। যা খুশি নিয়ে যাও। তোমার দরকার তো আমার চাইতে অনেক বেশি। দরকার না থাকলে কেউ কখনও এমন কনকনে শীতের রাত্রে আদুল-গায়ে ঘুরে বেড়ায়! আর শোনো, এই জুতোজোড়াটাও নিয়ে যেও কিন্তু। রাস্তায় তো কাঁটাখোঁচার অভাব নেই, খালি পায়ে হাঁটতে তোমার কষ্ট হয় না?"

লোকটি এবারে প্রায় কেঁদে ফেলল। হাতজোড় করে বলল, "আমাকে ক্ষমা করুন বাবু। আমি ভুল-বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। আপনি ক্ষমা না করলে আমি মরেও শান্তি পাব না। আপনার মতো সজ্জন ...।"

"আরে, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার দরকার, তাই তুমি এসেছ।" লোকটিকে সান্ত্বনা দিলেন কবি।

"না, বাবু, আমি অপরাধী। আপনি আমায় পুলিশে দিন।"

কবি বললেন, "তোমাকে পুলিশে দেবার মতলব থাকলে কখন সে-ব্যবস্থা করে ফেলতাম। তা যখন করিনি, ভয় কিসের? তোমার যা ইচ্ছে নিয়ে যাও। আমি তোমায় কিচ্ছু বলব না।"

লোকটি চুপ করে আগের মতো দাঁড়িয়ে রইল। কবি এবার সামান্য ধমক দিয়ে বললেন, "দ্যাখো, তোমাকে এত করে তোমার পছন্দমতো জিনিসপত্র নিতে বলছি, নিচ্ছ না। বেশ, ভাল। তাহলে আগে যেসব জিনিস নিয়ে গিয়েছিলে, সেগুলো তো বাপু আমার ফেরত চাই।"

লোকটি কান্নাজড়ানো গলায় বলল, "বাবু, আমি তো সেসব নিইনি। তবে কথা দিচ্ছি, যে নিয়ে গেছে আমি তাকে খুঁজে বার করব।"

তারপর যেমন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছিল, সেভাবেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লোকটি।

কিছুদিন বাদে কবি দেখলেন, তাঁর বাড়ির ছাদে চুরি-যাওয়া লেপ কম্বল তোশকগুলো পড়ে রয়েছে। সুন্দরভাবে ভাঁজ করা, কোথাও এতটুকু ধুলো-ময়লা পর্যন্ত লাগেনি!

অনুবাদ : রমা ভার্মা

ছবি : দেবাশিস দেব

রাতবেরাতে

পিনাকীনন্দন চৌধুরী

রাত নেমেছে ভয়ের ভিতর, মাঠ চিরে যায় হাওয়ার নখে
চাঁদের আলো কুণ্ডলীপাক ধোঁয়ার মতো। হঠাৎ ও কে!
ধব্‌ধবে এক শ্বেতাম্বরী এপার-ওপার আকাশ ঝাঁটায়,
শীত জমেছে দন্তমূলে, শজারুগা বিঁধছে কাঁটায়।
ঈশান কোণে গাছটা যেন অন্ধকারে স্কন্ধকাটা ...
একপা দোলে ডাল থেকে—কার! গগনভেদী অন্য পা'টা।

পিছন ফিরে পালাব যেই—ভীষণ কাণ্ড সৃষ্টিছাড়া
ছায়া আমার দৌড়ে পালায়, আমি চলচ্ছক্তিহারা।
পিছন থেকে আঁশটে গন্ধ জড়িয়ে ধরে আমার গলা—
আমার ছায়া হাওয়ার ভিতর দৌড়ে পেরোয় মস্ত জলা।
ফিস্‌ফিসিয়ে কে যেন কয়, 'নিজের কাছে নিজের কী ভয়।'
ছায়াছাড়া শরীর হলে রাতবেরাতে এমনটি হয়।

সম্পূর্ণ ভ্রমণকাহিনী

মাণ্ডুর রূপমতী

বুদ্ধদেব গুহ

পুবের আকাশ সবে লাল হচ্ছে।

রূপমতী বসে ছিলেন রূপমতী মহলের উপরের চবুতরায়। মাথার উপর পাথরের গম্বুজময় চাঁদোয়া ছিল পশ্চিমে। কিন্তু সেই চাঁদোয়ার আশ্রয় ছেড়ে তিনি এসে বসেছিলেন পুবের ছাদের এক কোণে। যেদিকে নিমারের উপত্যকা একলাফে নেমে গেছে হাজার হাজার ফিট নীচে ; খাড়া ভারী সুন্দর এবং ভয়ংকর সেই উপত্যকা গভীর জঙ্গলময়। মাঝে-মাঝে ভিলদের দু-একটি ছোট গ্রাম। উষাকালের এই আধো-অন্ধকারে এখন খুঁজে বের করাই মুশকিল। সন্ধের আগে বরং ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে বোঝা যায় যে, গ্রাম আছে কোথাও কোথাও। কুঁড়ি-সকালের কোরা, গন্ধের কোরা রঙের শামিয়ানার মতো হাল্‌কা কুয়াশার আস্তরণে মোড়া জঙ্গল। হর্‌জাই গাছ। বসন্তের ভোরের গায়ের মৃদু সুগন্ধে ভারী হয়ে আছে নিমারের দিগন্তলীন এই উপত্যকা।

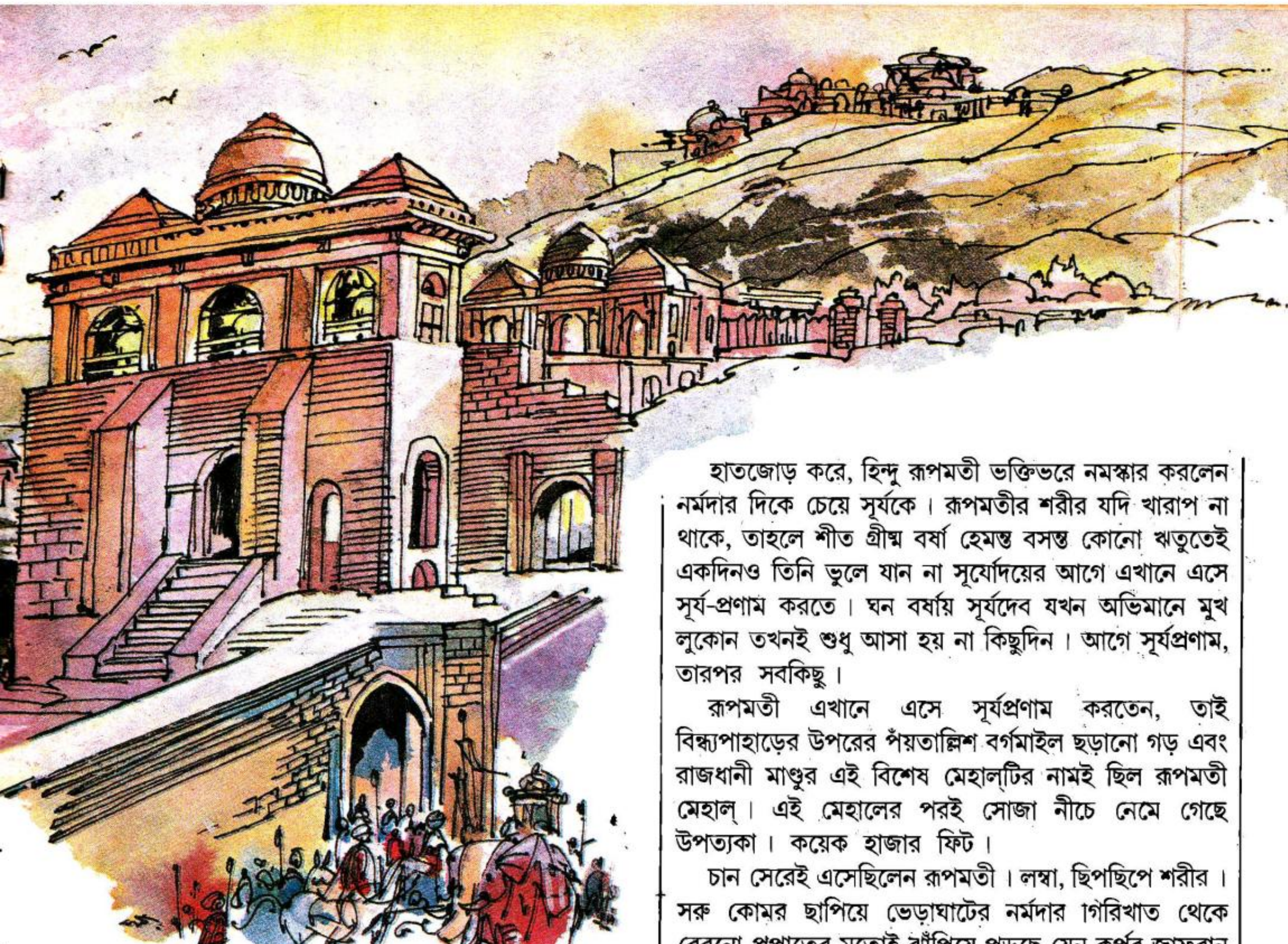

লাল হচ্ছে আস্তে আস্তে পুবের আকাশ। খুবই আস্তে আস্তে। লজ্জা পেলে, তোমাদের কারও কারও গাল যেমন লাল হয়; তেমন একদমকে নয়। অমলতাস গাছের থোকা-থোকা হলুদ ফুলে সেই লালের আভাস লেগে তাদের হলুদ ধীরে ধীরে গড়িয়ে যাচ্ছে কমলাতে। তিতির, বটের, আস্কল, ময়ূর ডাকছে নীচের উপত্যকা থেকে। তাদের ঐকতান, ভোরের গায়ের গন্ধের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে আলতো হাওয়ায় উঠে আসছে উপরে, কুয়াশারই মতো।

রূপমতীর পরিচারিকা বিজ্‌লি আঙুল দিয়ে তাঁকে দেখাল. দূ-রে, পুবে। হঠাৎ হাত তোলায়, তার কোমরের রুপোর পঁইছা আর চাবির থোকা ঝুনঝুনিয়ে উঠল। বেজে উঠল পায়ের পাঁয়জোর। বলল, "ওই যে! যাচ্ছে দেখা।"

সূর্য উঠছে। নর্মদা নদীর উপরে। জলের উপর ভোরের রোদ পড়ে চিক্‌চিক্ করে উঠছে আদিবাসী গোঁন্দদের দেবতা বুড়হা নাঙ্গের বউ, দুধ নাঙ্গের চক্‌চকে সাদা শরীরের মতো জলরেখা। পশ্চিমের গম্বুজ আর চাঁদোয়ার তলায় ততক্ষণে তানপুরা আর সারেঙ্গীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভৈরবীতে আলাপ শুরু করেছে রূপমতীর সখী মুন্নি। ভৈরবীর কোমল 'রে' আর কড়ি 'মা'র সঙ্গে চিকন চুয়াপাখির চকিত ডাক, অমলতাস ফুলের রঙের নরম আভাস, নিমারের উপত্যকার গায়ের গন্ধ সব মিলেমিশে ছড়িয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। যেন এক অদৃশ্য আতরদান হঠাৎ গড়িয়ে উল্‌টে গিয়ে ফিরদৌস্ আতরই ছড়িয়ে গেছে নিমারের আদিগন্ত উপত্যকায়।

হাতজোড় করে, হিন্দু রূপমতী ভক্তিভরে নমস্কার করলেন নর্মদার দিকে চেয়ে সূর্যকে। রূপমতীর শরীর যদি খারাপ না থাকে, তাহলে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত বসন্ত কোনো ঋতুতেই একদিনও তিনি ভুলে যান না সূর্যোদয়ের আগে এখানে এসে সূর্য-প্রণাম করতে। ঘন বর্ষায় সূর্যদেব যখন অভিমানে মুখ লুকোন তখনই শুধু আসা হয় না কিছুদিন। আগে সূর্যপ্রণাম, তারপর সবকিছু।

রূপমতী এখানে এসে সূর্যপ্রণাম করতেন, তাই বিন্ধ্যপাহাড়ের উপরের পঁয়তাল্লিশ বর্গমাইল ছড়ানো গড় এবং রাজধানী মাণ্ডুর এই বিশেষ মেহাল্‌টির নামই ছিল রূপমতী মেহাল্। এই মেহালের পরই সোজা নীচে নেমে গেছে উপত্যকা। কয়েক হাজার ফিট।

চান সেরেই এসেছিলেন রূপমতী। লম্বা, ছিপছিপে শরীর। সরু কোমর ছাপিয়ে ভেড়াঘাটের নর্মদার গিরিখাত থেকে বেরনো প্রপাতের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ছে যেন কর্পূর জাফরান আতর আর গোলাপজলে চান-করে-ওঠা রূপমতীর বাঁধ-না-মানা সুগন্ধ চুল। সেই খুশবু উড়ে যাচ্ছে আফগান নবাব বাজবাহাদুরের খুদাতালার তখত্ আর হিন্দু রূপমতীর দেবীর দিকে।

গন্ধ যখন ওড়ে, ফুল যখন ঝরে, তখন শব্দ হয় না কোনো। বনে, অথবা মনে।

হিন্দুর মেয়ে, বড় ভাল গাইয়ে রূপমতী যে কী করে আফগান নবাব বাজবাহাদুরের রাজধানীতে এসে পৌঁছেছিলেন তা নিয়ে লোকের মুখে আজও নানারকম গল্প শোনা যায়। এক গল্পের সঙ্গে অন্য গল্পের মিল নেই। এ ছাড়াও নানারকম গল্প।

কিন্তু সে সব গল্পের কথা পরে।

বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক ফিরিস্তা-উল্লিখিত একটি লোকগাথায় আছে যে, পাঁচশো নব্বুই থেকে ছ'শো আঠাশ খ্রিস্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেছিলেন যিনি সেই খুসরু পরভিজের সময়ে আনন্দ দেও রাজপুত বলে একজন লোক মাণ্ডুর দুর্গটি বানিয়েছিলেন। মাণ্ডুর নাম আগে ছিল মণ্ডপ দুর্গ। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এ দুর্গ বানানো হয়েছিল।

আবুল ফজল কিন্তু অন্য কথা বলেছেন। মাণ্ডু নামটি নাকি আসে তারাপুরের মণ্ডনা নামের এক স্বর্ণকারের নাম থেকে। মণ্ডনাই নাকি পরশপাথর খুঁজে পেয়েছিলেন। মণ্ডনা পরশপাথরটি দিয়ে দেন ধার-এর রাজাকে। ধার্-এর রাজা

সেই সুবাদে প্রচণ্ড বড়লোক হয়ে গিয়ে বিন্ধ্যপাহাড়ের উপর এই দুর্গ বানান এবং মণ্ডনার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত সেই দুর্গের নাম রাখেন 'মাণ্ডু'।

'মণ্ডপ-দুর্গ' নামের কোনো ভিত্তি অবশ্য পাওয়া যায় না ইতিহাসে। প্রাকৃত ভাষায় 'মাণ্ডভ' বলে একটি কথা আছে। 'মাণ্ডভ' শব্দটি মধ্যযুগের পারসিক ঐতিহাসিকদের লেখাতেও আছে। মাণ্ডভ থেকেই বিকৃত হয়ে 'মাণ্ডু' শব্দটি এসেছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

তার পরের তিন শতাব্দীতে ইতিহাস মাণ্ডু সম্বন্ধে নীরব। মনে হয় দশম শতাব্দীতে মাণ্ডুর এই দুর্গ গুর্জর-প্রতিহারী রাজাদের কনৌজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে মালোঁয়ার-পার্‌মার রাজাদের খুব রবরবা হয় এবং তাঁরা উজ্জয়িন্ এবং ধার্-এ তাঁদের রাজধানী নিয়ে যান। এই ধার্ জায়গাটি সমতলে। তার একদিকে ইন্দোর, অন্যদিকে ভোপাল, সিপ্রা নদীর পারের উজ্জয়িন্ও বেশি দূর নয়। এখান থেকে বিন্ধ্যপাহাড়ের উপরের মালভূমির এই মাণ্ডুর দুর্গের দূরত্ব মাত্র কুড়ি মাইল মতো।

রাজা ভোজের নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ হয়তো। বেতাল পঞ্চবিংশতি পড়েওছ হয়তো কেউ কেউ। ভালুকের থাপ্পড়-খাওয়া সেই 'স-সে-মি-রা'র গল্পও। রাজা ভোজ আর রাজা মুঞ্জ-এর সময়েই পার্‌মার রাজারা সবচেয়ে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ মাণ্ডুতে বেড়াতে যাও, তাহলে দেখতে পাবে মাণ্ডুর এলাকার অনেক 'তালাও'-এর মধ্যে একটির নাম হচ্ছে 'মুঞ্জ-তালাও'। তালাও মানে হচ্ছে দিঘি।

গজ্‌নির নবাব মেহমুদ্ যদিও ওই অঞ্চলের হিন্দু রাজাদের একেবারে তটস্থ করেই রেখেছিলেন কিন্তু মাণ্ডুর দুর্গের ভৌগোলিক অবস্থান এবং তাঁর সেনাদের সাহসের কারণে তাঁকেও পার্‌মার ভোজরাজকে সমীহ করে অন্য পথ দিয়েই ফিরে যেতে হয়েছিল অনেক যুদ্ধ জয়ের পরে। শুধু মাণ্ডুর দুর্গমতা ও দুর্ভেদ্যতারই কারণে।

ভোজরাজের সবচেয়ে সম্মানিত দেবী ছিলেন সরস্বতী। সরস্বতীর একটি মূর্তি পাওয়া যায় এখানে। সেই মূর্তির গায়ে প্রাকৃত ভাষাতে সরস্বতী-স্তবের মন্ত্রও ছিল বলে জানা গেছে।

ধার্-এর প্রবল-প্রতাপ রাজা উদয়াদিত্যের পর তাঁর অপেক্ষাকৃত দুর্বল বংশধরেরা পাহাড়ের উপরের মাণ্ডুতে মাঝে-মাঝেই রাজধানী তুলে নিয়ে আসতেন ধার্-এর সমতল ভূমি থেকে। পরে মাণ্ডুকেই স্থায়ী রাজধানী করে নেন তাঁরা, তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই।

এমনিতেই তো ইতিহাস তোমাদের অনেকেই পড়তে হয় স্কুলে। মাণ্ডুর রাজা-রাজড়াদের ইতিহাস তোমাদের ভাল না-ও লাগতে পারে। তাই চলো, এবার মাণ্ডুর কথাতেই ফিরি। তারপরে একলাফে চলে যাওয়া যাবে বেশ কয়েক শতাব্দী পরে। রাজা আর নবাবদের কাছে।

॥ ২ ॥

মাণ্ডুর বাজবাহাদুর আর রূপমতীর নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

যে-মাণ্ডু এঁদের জীবনকাহিনীর পটভূমি, সে জায়গাটি কেমন সে সম্বন্ধে বিশদ করে এবার তোমাদের একটু বলে নিই। আগেই বলেছি, মাণ্ডু দুর্গটির এলাকা ছিল পঁয়তাল্লিশ বর্গমাইল। বিন্ধ্যপাহাড়ের এক দুর্গম মালভূমির উপর বিস্তৃত মসজিদ, মাদ্রাসা, তাবেলা, মেহালের পর মেহাল, তালাও-এর পর তালাও নিয়েই এই মাণ্ডু। কী সুন্দর যে ছিল এই মাণ্ডু রূপমতী আর বাজবাহাদুরের সময়ে তা আজও সেখানে গেলে যার চোখ আছে আর কল্পনা আছে, তার পক্ষে অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না কোনো। রুক্ষ দুর্ভেদ্যতার ভিতরে যে কী কমনীয়তা আর আনন্দের উপকরণ ছিল এখানে একদিন, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

ধার্ হয়ে আসতে হয় মাণ্ডুতে। ইন্দোর থেকেই কাছে পড়ে। ইন্দোর থেকে বেরিয়ে এসে যে জায়গায় সুন্দরী নদী সিপ্রার তীরের উজ্জয়িন্ শহরের রাস্তা বেরিয়ে গেছে, সেই পথে না গিয়ে সোজা পশ্চিমে চলে আসতে হয়। ধার্-এর মহারাজার বাড়িটি দেখা যায় দূর থেকে। ধার্ থেকে বাঁয়ে পথ চলে গেছে মাণ্ডুর দিকে।

পাহাড়ের উপর এই দুর্গে ওঠার বিভিন্ন পথ আছে। সেই সব পথে ফটক আর দরওয়াজা। সেই সব ফটক পেরিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনীর পক্ষেও তখন যাওয়া অতি কষ্টকর ছিল। 'আলমগির' দর্‌ওয়াজা, 'ভাঙ্গি' দর্‌ওয়াজা, 'কামানি' ও গাদি দর্‌ওয়াজা। দেখার মতো সব।

মহম্মদ খিল্‌জি চোদ্দশো ছত্রিশ সালে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে এনে বাওবাব গাছ লাগিয়েছিলেন মাণ্ডুতে। বাওবাব্, প্রকৃতির এক আশ্চর্য খেয়াল। পুব আফ্রিকাতে যখন গেছিলাম তখনও এই বাওবাবগাছ দেখেছিলাম অনেক। কত হাজার বছরের সব পুরনো স্থবির গাছ। প্রকাণ্ড মোটা হয় এদের গুঁড়ি। সুকুমার রায়ের আবোল তাবোলের মূল সংস্করণে হটুমুলার গাছের যে-ছবি আছে, তার সঙ্গে এই গাছের মিল আছে। সেই ছবি তোমরা কি দেখেছ কেউ ? ইংরিজিতে এই গাছকে বলে 'আপ্‌সাইড্ ডাউন ট্রিজ'। এই গাছের আরেক নাম 'খুরসানি ইম্‌লি'। গরমের দিনে মাণ্ডুর জাহাজ মেহালের আর জামা মসজিদের পাশে গাছের ছায়ায় বসে মাণ্ডুর অধিবাসীরা বাওবাবের বড় বড় ফল বিক্রি করে কেটে কেটে। মাণ্ডুতে যাঁরা বেড়াতে যান তাঁদের জন্যে।

খির্‌নিগাছও আছে অনেক। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। ছায়া-দেওয়া গাছ। গোল-গোল পাতা। মার্চ এপ্রিল মে মাসে লাল-লাল ফল হয়। মিষ্টি খেতে। আরও কত গাছ। আতাগাছ। কেঁদ বা বিড়িপাতার গাছ। কাড়োয়া টেম্‌রু, দেখতে কেঁদেরই মতো। কিন্তু কেন্দুর ফল মিষ্টি, এর ফল টক। কেঁদ আর টেম্‌রুও গরমের সময়ই হয়। চারোলি বলেও একরকমের বড় বড় গাছ দেখা যায় এখানে। লম্বাটে গড়নের বড় বড় পাতা। এপ্রিল মে'তে ফল হয়। টক-টক খেতে। ধাওড়াগাছ—গঁদের আঠা হয় এ গাছ থেকে। মহুয়া, আম, কাঁটাল, পলাশ। জামুন্। ইম্‌লি বা তেঁতুল। আম্‌লা বা আমলকীর গাছ। নিম। বহেড়া।

রোসিয়া ঘাসে ছেয়ে থাকে মাণ্ডু। পাথুরে লাল মাটি। এই ঘাস থেকে একরকমের তেল হয়। ওষুধ বানায় এখানের লোকেরা এই তেল থেকে। গোন্দিয়া ঘাসও হয়। গোরুতে খায় এই ঘাস। গিরমিলা অর্থাৎ অমলতাস এখানের বিশেষত্ব। দেখতে অনেকটা রাধাচূড়ার মতো। এপ্রিল-মে মাসে হলুদ-হলুদ লম্বা বিনুনির মতো ফুল ঝোলে গাছে গাছে।

বর্ষায় কাক্‌ড়ি হয়। বালম্ কাক্‌ড়ি।

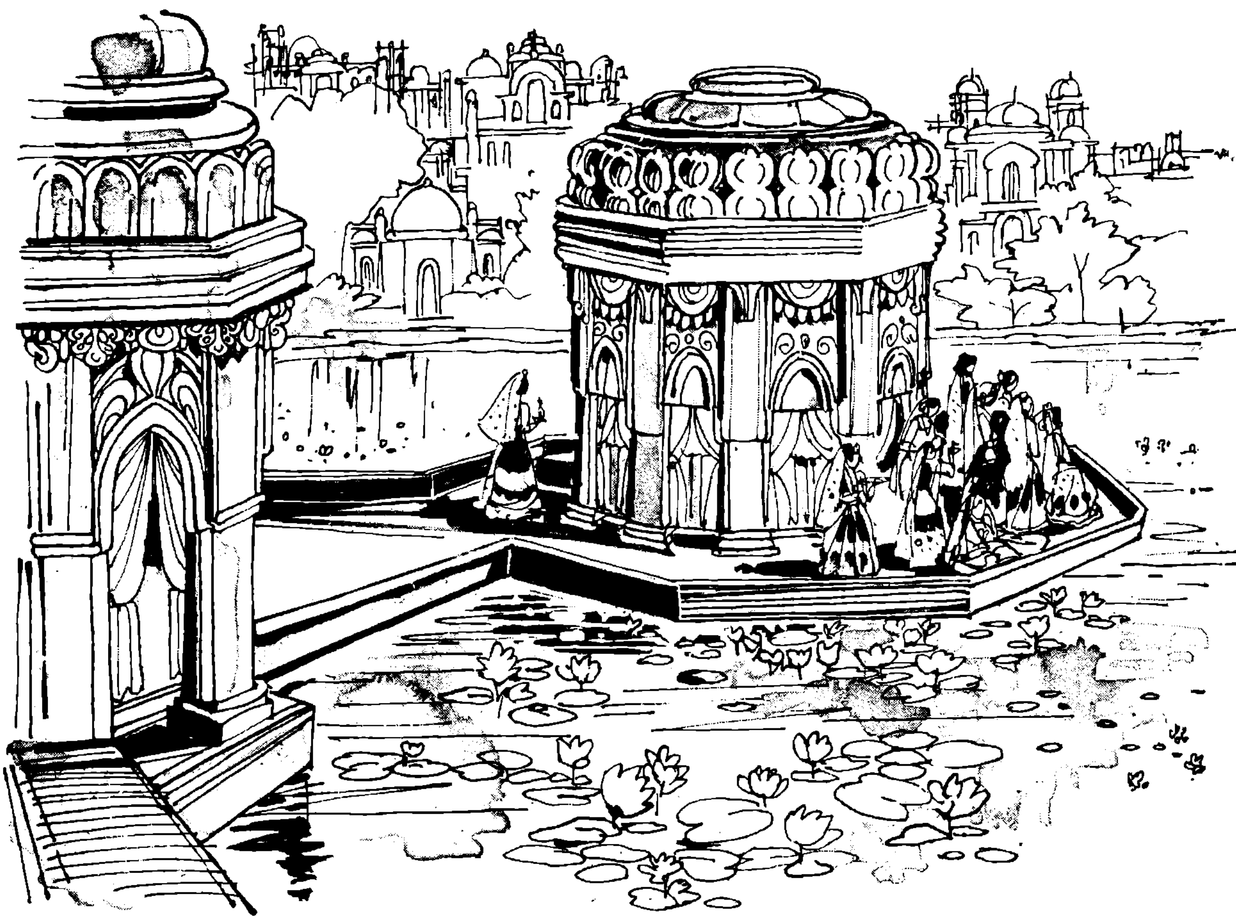

মাণ্ডুতে ফুলও কম হয় না। পদ্মর জন্য মাণ্ডুর তালাওগুলি বিখ্যাত। গরমের সময় লাল পদ্মে ভরে যায় সবকটি তালাও। ছোট ছোট একরকমের পদ্ম হয় এখানে, নাম কুমুদিনী। বর্ষা ও শীতে। লাল আর সাদা। যখন উদাস, বিধুর হাওয়া ছাড়ে গরমের দিনে তখন পদ্মপাতারা একসঙ্গে হাত নাড়ে। যেন হাত নেড়ে নেড়ে বলে, 'যাব না যাব না ঘরে ...।' আর হাওয়া যখন উল্টোদিকে বয়, তখন পাতার ভিতরের দিকের সাদা রঙ বেরিয়ে পড়ে। তখন তারা মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, কথা রাখলে না তো! এলে না তো!

মুসলমান ঐতিহাসিক গুলাম ইয়াজ্‌দানি মাণ্ডুকে 'শারাংপুর' বা 'আনন্দের শহর' বলে অভিহিত করেছিলেন। মাণ্ডু এখনও আনন্দের শহর বলেই পরিচিত সারা পৃথিবীর কাছে।

রূপমতী সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিক নানা কথা লিখে গেছেন। ইতিহাস তার নাম দিয়েছে 'পদ্মবালা'। 'লেডি অব লোটাস্'।

অনেকের মতে রূপমতী ছিলেন ধরম্‌পুরীর এক ব্রাহ্মণের মেয়ে। এরকম গাইয়ে তখন নাকি সে অঞ্চলে ছিলই না। রূপমতী মেহালের দুই গম্বুজের মধ্যের ঝরোকাও বাজবাহাদুর বানিয়ে দেন তাঁর জন্যে, যাতে ধার্মিকা রূপমতী নর্মদার দিকে চেয়ে শীত-সকালেও সূর্যপ্রণাম করতে পারেন।

এখানে এলে, ঘুরে বেড়ালে, পাথরে পাথরে, চাতালে চাতালে যেন নৃত্যরতা সুন্দরীদের পায়ের ঘুঙুরের শব্দ শোনা যায়। এক আশ্চর্য, ক্ষুধিত পাষাণপুরী ও।

রূপমতীর প্রিয়তম রাগ নাকি ছিল মেঘমল্লার। লোকে এও বলে যে, তাঁর নাম ছিল রূপা। বাজবাহাদুরই আদর করে নাম রাখেন রূপমতী। কোমলগান্ধারের মতো। রূপমতী মেহালের নীচের নিমার উপত্যকাতে ঘাসেরই মতো, স্বপ্ন বোনা আছে। গ্রীষ্মের হালকা গরম বাষ্প ও শীতের কুয়াশা না থাকলে কুড়ি-বাইশ মাইল দূরের নর্মদাকে পরিষ্কার দেখা যায় এই রূপমতী মেহাল্ থেকে। টিটোরি বা টিটি পাখি চম্‌কে চম্‌কে ডেকে বেড়ায় অতীতের কতই না কথা মনে করিয়ে দিয়ে। তিত্বর, বটের, কালি তিত্বর, কালি চিড়িয়া, ছোট চাতক পাখি, নানারকম বক, সারস, ময়ূর। ডাঙা ও জলের নানান পাখিই ছিল। আজও নানা জাতের ঝাঁক-ঝাঁক পায়রা ডানায় রোদ মেখে নিয়ে উজ্জ্বল রোদকণা ছাড়িয়ে ছিটিয়ে স্বপ্ন দিয়ে তাঁত বোনে মাণ্ডুর আকাশে আকাশে। শীতের মুখে উড়ে আসে নানা দেশ থেকে পরিযায়ী হাঁসের দল। তালাওয়ে তালাওয়ে সুখের সংসার পাতে। স্বগতোক্তি করে ভেসে বেড়ায় তালাওয়ের পদ্মরাঙা জলে।

ওরাও যে কবে খোঁজ পেয়েছিল এই আনন্দ আর খুশির শহরের তা কে জানে! কত হাজার বছর ধরে সাইবেরিয়া এবং আরও কত অঞ্চল থেকে কত রকম পাখি পথ চিনে উড়ে আসে প্রতি বছর। আনন্দে ভরপুর হয়ে, অন্যকে ভরপুর করে আবার ফিরে যায় শীতশেষে।

ভিল্ উপজাতিদের বাস এখানে। তারা শিকারির জাত। রাজা আর নবাবরা এখানে কত বাঘ ও চিতা যে শিকার করেছেন তা লেখাজোখা নেই।

রূপমতীও বাজবাহাদুরের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে বাঘ শিকারে যেতেন। এখন অবশ্য জানোয়ার মাণ্ডুতে বিশেষ নেইই। রাত নামলে, সাবধানী তুরতুরে খরগোশেরা ইতিউতি চাইতে চাইতে ঘাসের বনের খাবার খুঁটে খায়। তাদের পেছনে পেছনে আসে

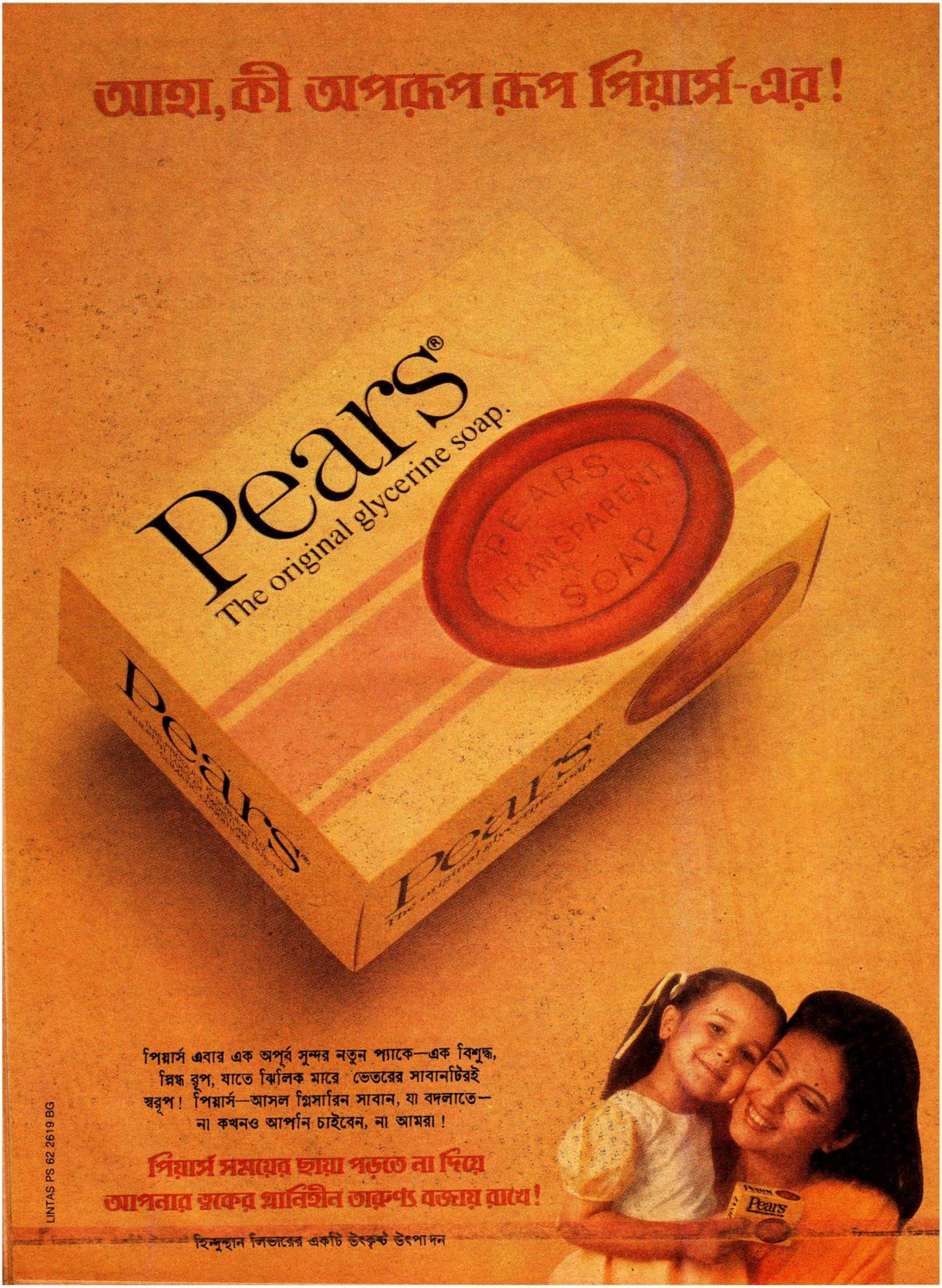
আহা, কী অপরূপ রূপ পিয়ার্স-এর!
Pears®
The original glycerine soap.
PEARS TRANSPARENT SOAP
পিয়ার্স এবার এক অপূর্ব সুন্দর নতুন প্যাকে—এক বিশুদ্ধ, স্নিগ্ধ রূপ, যাতে ঝিলিক মারে ভেতরের সাবানটিরই স্বরূপ! পিয়ার্স—আসল গ্লিসারিন সাবান, যা বদলাতে—না কখনও আপনি চাইবেন, না আমরা!
পিয়ার্স সময়ের ছায়া পড়তে না দিয়ে আপনার ত্বকের গ্লানিহীন তারুণ্য বজায় রাখে!
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
LINTAS PS 62 2619 BG

সাবধানী, ধূর্ত শেয়ালেরা। হায়নার বুককাঁপানো হাসি শোনা যায় মাঝরাতে। কখনও-কখনও।

রূপমতী থাকতেন জাহাজ মেহালে আরও অসংখ্য সব নাম-না-জানা সুন্দরীদের সঙ্গে। জাহাজ মেহালে তখন দুটি সুইমিং পুল ছিল। একতলাতে একটি, দোতলাতে একটি। আজ থেকে কত শ' বছর আগে। ভাবা যায়! পার্সিয়ান হুইলে করে জল উঠত দোতলার সুইমিং পুলে। মোষেরা ঘুরে ঘুরে টানত সেই পার্সিয়ান হুইল। জল উঠত জাহাজ মেহালের মস্ত তালাও থেকে।

মারোয়াড়ি ব্যবসাদারদের বোধহয় কোনো দেশবিচার নেই। সময় বিচারও নেই। অন্তত এখানের লোকেরা তাইই বলেন। যেখানেই পয়সা কামাবার মওকা, সেখানেই তাঁরা গিয়ে হাজির হয়েছেন চিরদিন।

গাধা শাহ্ আর ভইষা শাহ্ বলে দুই মারোয়াড়ি, হোশাঙ্গ শাহ ঘুরির সময় মাণ্ডুত এসে আস্তানা গাড়েন। কী করে তাঁরা এলেন, তা নিয়েও গল্প আছে। লোকে বলেন, গাধা শাহ্ তাঁর মাকে পাঠিয়েছিলেন তীর্থ করতে, অনেক টাকা-পয়সা দিয়ে। সঙ্গে তাঁর গোঁফের চুলও খানিকটা কেটে দিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পয়সা যদি ফুরিয়েও যায়, তবে যাঁকেই এই গোঁফের চুল দেখাবে আর বলবে যে, আমার ছেলে হচ্ছে দা গ্রেট গাধা শাহ্, অমনি তাঁরা তোমাকে টাকা দেবেন। গুজরাটে গিয়ে গাধা শাহ্র মায়ের টাকা তো গেল ফুরিয়ে। তখন গুজরাটিদের কাছে ছেলের গোঁফ পেশ করলেন তিনি। গুজরাটিরা বললেন, ওসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না আমরা। গাধার কাছেও ঠকব এমন গাধা আমাদের ভাবা উচিত নয়। টাকা-ফাকা দেব না।

মা গিয়ে নালিশ করলেন। গাধা আর ভইষা শাহ্ তারপর মাণ্ডুতে চলে আসেন। সোন্‌গড়ের খাড়া পাহাড়ের নীচে দুটি মস্ত ইঁদারা খুঁড়ে তাঁরা নাকি তেল আর ঘি সেখানে মজুদ করেছিলেন। মাণ্ডুতে তখন যজ্ঞ-টজ্ঞের জন্য এবং নবাবি খানা বানানোর জন্যও নিশ্চয়ই ঘি'র দরকার ছিল অনেক। এবং প্রদীপ জ্বালানোর জন্য তেলের চাহিদাও ছিল কম নয়। একদিন গুজরাটি ব্যবসাদারেরা গুজরাট থেকে গাধা অ্যাণ্ড ভইষা কম্পানির কাছে তেল ও ঘি কিনতে আসেন। তখন তাঁরা বলেন যে, আমাদের মাকে আপনারা বেইজ্জত করেছিলেন, টাকা দেননি মোটে, গাধা শাহ্র গোঁফ দেখানো সত্ত্বেও, তেল ঘি আপনাদের দেব থোড়াই। কথা কিছু খারাপ বলেননি তাঁরা। কারণ আমরা জানি যে, "গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা।" তারপর বললেন, ঠিক হ্যায়। বেচতে পারি, কিন্তু দুটি শর্তে। প্রথম শর্ত হল, আজ থেকে আপনারা আপনাদের দাঁড়িপাল্লাতে চারটি করে সুতোর বদলে মোটে তিনটি সুতো ব্যবহার করবেন। আর ধুতি পরার সময়, মাত্র একটি কাছা কোমরে গুঁজতে পারবেন।

সেই থেকেই নাকি গুজরাটি ব্যবসাদারেরা দাঁড়িপাল্লাতে তিনটি সুতো ব্যবহার করেন, আর ধুতির কাছার একদিকটা কোমরে গুঁজে অন্যদিক হাতে নিয়ে চলেন।

এসব লোকগাথার কিছু হয়তো বানানো। বলা যায় না, অনেকখানিই হয়তো তাই। কিন্তু বানানো হলেও বা ক্ষতি কী? লোকমুখে এসব গল্প চলে আসছে বহু বছর ধরে। শুনতে তো মজাই লাগে! কী বলো?

'আনন্দের শহর' মাণ্ডুর মানুষ সেখানে আনন্দের কোনো উপকরণই বাদ দেননি। এখানে পান-রসিক লোকও ছিলেন অনেক। কতরকম নবাবি কেতার পানই যে ইস্তেমাল হত! এখনও দোকানে দোকানে মাল্‌বী, মগ্‌ধী, বাঙালি, মাদ্রাজি পান পাওয়া যায়। পানের সঙ্গে গুটকা।

ইত্বরেরও ছড়াছড়ি ছিল। খস্‌স্, রুহ্ খস্‌স্, গুলাব, রাত-কা-রানি, হিম্বা, বেলি, অম্বর ফিরদৌস, শামামা— আরও কত নাম-জানা আর নাম-না-জানা সব ইত্বর। বাজবাহাদুর যখন শিকারে যেতেন, তখন একরকমের ইত্বর ব্যবহার করতেন, তার নাম "ইত্বর-ই-খ্বিল।" খ্বিল হচ্ছে মাটি। মানে, মৃত্তিকাগন্ধি আতর। বাঘ যাতে হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ মানুষের গন্ধ না পাঁউ, সেই বন্দোবস্তেই এই মাটির গন্ধের আতর মেখে বাঘ শিকারে যেতেন বাজবাহাদুর।

মাণ্ডুর দুর্গই নাকি সেই সময়ে পৃথিবীর বৃহত্তম দুর্গ ছিল। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, শুধু বেলজিয়ামে অন্য একটি প্রায় এত বড় দুর্গ ছিল; সেটিই দ্বিতীয় ছিল দুনিয়াতে। দর্‌ওয়াজা, হাবেলি, তবেলা (আস্তাবল) আর মসজিদ কিছুরই কম্মি ছিল না মাণ্ডুতে।

মাণ্ডুর কথা তো শুনলে অনেক, এবারে আবার চলো যাই কিছুক্ষণের জন্য মাণ্ডুর শাসকদের ইতিহাসে। মাণ্ডুরই এক শাসক বাজবাহাদুর অবধি পৌঁছেই আবার মাণ্ডুর কথাতেই ফিরে আসা যাবে। বাজবাহাদুররা ছিলেন আফগান।

॥ ৩ ॥

দিল্লির নবাবরা ইতিমধ্যে মাণ্ডু এবং আশপাশের জায়গার, 'ধার্'সুদ্ধ, মালিক হয়ে গিয়েছিলেন।

মহম্মদ বিন্ তুঘলকের অধীনে একজন কর্মচারী ছিলেন। নাম ছিল তাঁর দিলাওয়ার খান ঘুরি। তাঁকে মালোয়াঁর রাজ্যপাল করে দেন মহম্মদ বিন্ তুঘলক। দিল্লির মসনদ নড়বড়ে হয়ে যেতেই ঘুরি নিজেই মালোয়াঁর নবাব বনে গেলেন। বোকা তো আর ছিলেন না। তাঁর রাজধানী তিনি ধার্-এই রেখেছিলেন বটে, কিন্তু মাণ্ডুতে আসতেন মাঝে-মাঝেই। চোদ্দশো পাঁচ শতাব্দীতে দিলাওয়ার খাঁ মারা গেলে তাঁর ছেলে আল্প খাঁ নবাব হন। তাঁর আসল নাম ছিল, হোশাঙ্গ শাহ। তিনিই প্রথম মাণ্ডুকে পুরোপুরি রাজধানী করেন। মাণ্ডুর দুর্গের অনেকই সম্প্রসারণ করেন হোশাঙ্গ শাহ। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে, সেই সময়কার ভারতে তো বটেই, পৃথিবীতেও মাণ্ডুর মতো এত বড় এবং এত সুরক্ষিত দুর্গ দেখা যেত না। আজকে গিয়ে দেখলেও সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয় তার সৌন্দর্য, দুর্ভেদ্যতা এবং দুর্গমতা দেখে।

হোশাঙ্গ মারা গেলেন চোদ্দশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর ছেলে ঘজ্নি খাঁ নবাব বনলেন। কিন্তু এক বছর মাত্র নবাবি ছিল তাঁর কপালে। পরের বছরই তাঁর এক অনুচর মাহমুদ খাঁ তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেললেন।

এই ঘজ্নি খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মালোয়াঁতে ঘুরিদের নবাবি শেষ হয়ে গেল। ঘুড়ি নয় কিন্তু, ঘুরি। তোমরা ভাল করে ইতিহাস পড়লে জানতে পারবে যে, আকাশের ঘুড়িরই মতো ঘুরিদের মধ্যেও পেটকাট্টি, চাঁদিয়াল বিষ-গেলানো ঘুরি ছিল।

মাহমুদ শাহই মাণ্ডুর প্রথম খল্জি শাসক। ভাল, খুবই ভাল যোদ্ধা ছিলেন মাহমুদ খাঁ। আরামপ্রিয় ছিলেন না। আরাম তাঁর কাছে হারাম ছিল। তাঁকে সবাই-ই জানতেন লড়াকু নবাব বলে। তাঁর আমলেই মালোয়াঁ বিস্তৃতিতে অনেকই বেড়েছিল। মান পেয়েছিল। ছড়িয়ে পড়েছিল মালোয়াঁর নাম। সবসুদ্ধ তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন তিনি। সেই সময়ের মধ্যে গুজরাট, দাক্ষিণাত্য এবং জৌনপুরের রাজাদের সঙ্গেই যে যুদ্ধ করেছিলেন তিনি তাই-ই নয়, দিল্লির নবাবদের সঙ্গেও টক্কর দিতে পিছপা হননি। তবে মেবার ছিল মাহমুদের আক্রমণের প্রিয় লক্ষ্য।

শুধু বড় যোদ্ধাই নন, মাহমুদ্ খাঁ অত্যন্ত বড় মনের, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দয়ালু এবং সাহসী নবাবও ছিলেন। তাঁর আমলে হিন্দু এবং মুসলমান প্রজারা সমান সচ্ছলতা এবং সুখে ছিল। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত গুণাবলীর জন্যেই মালোয়াঁ অত উন্নতি করেছিল। ইতিহাস বারবার বলে যে গুণ না থাকলে কেউই জীবনে বড় হতে পারে না। মাণ্ডুর ভিতরেও খুব উন্নতি হয়েছিল সেই সময়েই। মাণ্ডুতে তাঁর নিজের কবরস্থান বানিয়েছিলেন তিনি। অপূর্ব ! এখনও গেলে দেখতে পাবে। মাদ্রাসা, মানে, মুসলমানদের পাঠশালা বানিয়েছিলেন ; তাও চমৎকার। সেই মাদ্রাসাকে এখন সকলে 'আশ্‌রফি মেহাল' বলে। সেটিও দেখতে পাবে, গেলে।

মাহমুদ্ মারা গেলেন চোদ্দশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দে। তাঁর ছেলে ঘিয়াত্‌উদ্দিন নবাব হলেন। কী বিদঘুটে নাম রে বাবা ! নাম শুনে মনে হয় খ্যাঁক করে কামড়েই দেবেন বুঝি, কিন্তু তিনি খুব ধার্মিক মানুষ ছিলেন। বাবা অনেক যুদ্ধ করেছিলেন বলেই বোধহয় ছেলে শান্তিপ্রিয় ছিলেন খুবই। তবে, বাবার সঙ্গে ছেলের তফাত ছিল। বাবা কষ্ট করে সব কিছু করেছিলেন আর শান্তিপ্রিয় তিনি ফুর্তিতে মেতে গেলেন। বাঙালি ছেলেদের মতো ! পনেরো হাজার বিবিই ছিল তাঁর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মেয়ে তারা। তাঁর ডাইনে এবং বাঁয়ে পাঁচশো সুন্দরী, অল্পবয়সী, তুর্কি এবং পাঁচশো অ্যাবিসিনিয়ান্ যুবতী পুরুষের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে থাকত তাঁর প্রহরী হিসেবে।

মাণ্ডুতেই থাকতেন বলে সেখানে আরাম ও বিলাসের আরও বন্দোবস্ত করেছিলেন তিনি। 'জাহাজ মেহাল' খুব সম্ভব মাণ্ডুর সব চাইতে সুন্দর মেহাল। বাজবাহাদুর আর রূপমতীর প্রিয় মেহাল। এই জাহাজ মেহালের কথা বলে শেষ করা যায় না। পরে আরও বলছি তোমাদের। ঘিয়াতের আমলেই বোধহয় জাহাজ মেহালের সবচাইতে বেশি ইজ্জত হয়েছিল। জাহাজ মেহাল তিনিই বানিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বের সময়ে দান, ধ্যান, সব প্রজার মধ্যে সমতা, বিচার, ঔদার্য সব কিছুরই জন্যে মাণ্ডু খুবই বিখ্যাত হয়েছিল। বাবার এত থাকলে যে-কেউই পরের ধনে পোদ্দারি করতে পারে। বাহাদুরি কী তাতে ?

ঘিয়াতের যখন আশি বছর বয়স তখন তাঁর ছেলে নাসিরুদ্দিন তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেললেন। দিল্লির শাহানশাহ্ জাহাঙ্গির তাঁর স্মৃতিকথাতে এই বিশ্বাসঘাতক ছেলের নিজের বাবাকে খুন করার কথা খুব ঘৃণাময় আবেগের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তখন নবাববংশে বুড়ো বাবাকে মকরধ্বজ আর চ্যবনপ্রাশ খাওয়ানোর চেয়ে বিষ খাওয়ানোরই বেশি চল ছিল।

বাবাকে বিষ খাইয়ে নবাব তো হলেন নাসিরুদ্দিন পনেরোশো খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু পাপবোধ তাঁকে একেবারেই জর্জরিত করে রাখল সব সময়। ঝামেলাও পোহাতে হয়েছিল তাঁকে অনেকই। মাত্র দশ বছর নবাবি করেই একদিন প্রচণ্ড জ্বরে বেহুঁশ হয়ে মারা গেলেন তিনি।

পিতৃহত্যার জঘন্য অপরাধের কারণে বাদশা শেরশাহ যখন মাণ্ডুতে এসেছিলেন তখন নাসিরুদ্দিনের কবরস্থান এবং কবরে শায়িত তাঁর গলিত মৃতদেহের প্রতিও অনেক অসম্মান দেখিয়েছিলেন। জাঁহাপনা জাহাঙ্গিরও তাই-ই করেছিলেন।

নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় ছেলে দ্বিতীয় মাহমুদ্ নবাব হলেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো তিনিও স্থাপত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁর আমলেও মাণ্ডুতে অনেক মেহাল ইত্যাদি যোগ হল। মাণ্ডুর রেওয়া-কুণ্ডের কাছে এখন যে মেহালের নাম 'বাজবাহাদুর মেহাল' সেটি তাঁরই বানানো। পদ্মবনে ভরা ছোট্ট এক তালাও বিন্ধ্যপাহাড়ের উপরের মালভূমিতে। মাণ্ডুতে সেই তালাওর মধ্যেই মেহাল। সেখান থেকে সোজা চাইলে দেখা যায় রূপমতীর জন্যে বাজবাহাদুরেরই বানিয়ে দেওয়া 'রূপমতী মেহাল'।

দ্বিতীয় মাহমুদের আমলে বাবার আমল থেকে শুরু হওয়া নিজেদের মধ্যের পারিবারিক কোঁদল এক সাংঘাতিক রূপ নিল। সেই ঝগড়া থামাতে তিনি রাজপুত সর্দার মেদিনী রায়ের সাহায্য নিলেন। কিন্তু নিঃস্বার্থ সাহায্য এ পৃথিবীতে কে আর কাকে করে ! কিছুদিন পর রাজপুত মেদিনী রায় পুরো মাণ্ডুই প্রায় নিজের কব্জাতে এনে ফেললেন। ব্যাপার মোটেই সুবিধের নয় তা বুঝতে পেরে আগেই মাহমুদ্ পালিয়ে গেলেন

গুজরাটে। সেখানে গিয়ে গুজরাটের নবাব দ্বিতীয় মুজাফ্‌ফর শাহর সাহায্য নিয়ে রাজপুত মেদিনী রায়কে মাণ্ডু থেকে তাড়ালেন।

তাড়ালেন, কিন্তু ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করল নিজেকে। গুজরাটের নবাব, দ্বিতীয় মুজাফ্‌ফর শাহর ছেলে বাহাদুর শাহর সঙ্গে মাহমুদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে এল। এবং বাহাদুর শাহ পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে মালোয়াঁ আক্রমণ করে মাহমুদকে বন্দী করলেন। এবং মালোয়াঁকে গুজরাটের তাঁবে নিয়ে এলেন, অন্তর্ভুক্ত করে।

পনেরোশো চৌত্রিশ অবধি মালোয়াঁ গুজরাটের অধীনেই থাকল, যতদিন না বাদশা হুমায়ুন মাণ্ডু আক্রমণ করে আবার তা দখল করলেন। তখনকার গুজরাটের রাজা বাহাদুর শা প্রাণ বাঁচালেন মাণ্ডু থেকে। সোন্‌গড়ের দিক দিয়ে পালালেন তিনি। সোন্‌গড়ের অত খাড়া উচ্চতা থেকে ঘোড়াগুলোকে সব আগে নিমারের উপত্যকায় নামিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর নিমার দিয়ে ঘোড়া চড়ে পালিয়ে যান। মাণ্ডুতে গেলে তোমরা সোন্‌গড়ও নিশ্চয়ই দেখে আসবে। মাণ্ডুর আর সোন্‌গড়ের মধ্যে যোগ আছে। এত শতাব্দী পরও তার অবস্থান এবং দুর্গমতা দেখলে অবাক হয়ে যাবে তোমরা। ওই রকম উঁচু ও খাড়া জায়গা থেকে ঘোড়াদের যে কী কায়দায় নামানো সম্ভব, তা আজও ভাবলে অবাক হতে হয়।

বাহাদুর শাহ তো প্রাণ নিয়ে পালালেন। হুমায়ুনও মাণ্ডু জয় করে ফিরে গেলেন মালোয়াঁ ছেড়ে। অত বড় বাদশার সময় কোথায় ওখানে পড়ে থাকার। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুযোগ বুঝে আগেকার খল্‌জি বংশের একজন লোক, মাল্লু খাঁ, হুমায়ুনের সেনাবাহিনীরই একজন সেনাপতি, মাণ্ডুর রাজা বনে তখ্‌তে বসে গেলেন।

রাজাদের গদি বাগানোর ব্যাপার-স্যাপার অনেকটা মিউজিকাল-চেয়ারের মতোই মনে হচ্ছে, তাই না ?

পুবে নিমার উপত্যকা পেরিয়ে নর্মদা অবধি এবং অন্যদিকে ভিল্‌সা অবধি দখল করে নিয়ে নিজেকে নিজেই নবাব 'কাদির শা' উপাধি দিয়ে মাণ্ডুর তখ্‌তে বসে গেলেন পনেরোশো ছত্রিশে মাল্লু খাঁ। কিন্তু নবাবির সুখ বেশিদিন সয় কম লোকেরই। বড়ই মিশ্র-সুখ তা। সুখের সঙ্গে দুঃখে ভরা। মাত্র ছ' বছর পরেই শের শাহ্‌ পনেরোশো বেয়াল্লিশে হালুম্‌-হুলুম্‌ করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এসে কাদিরের উপর। বাঘের সঙ্গে খাটল না তাঁর জারিজুরি ! মালোয়াঁ ছিনিয়ে নিয়ে শুজ্জাত খাঁকে মালোয়াঁর রাজ্যপাল বানিয়ে দিয়ে চলে গেলেন শের শাহ্‌, বাঘেরই মতো ; গোঁফে চুমকুড়ি দিয়ে।

পনেরোশো চুয়ান্নোতে মারা গেলেন শুজ্জাত খাঁ, একজন স্বাধীন নবাবেরই মতো। কারণ, কেউই খবরদারি করতে আসত না তাঁর উপরে ; দিল্লি থেকে অত দূরের মালোয়াঁতে। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর তিন ছেলের মধ্যে খেয়োখেয়ি লেগে গেল। শেষে তাঁর এক ছেলে, মালিক বায়াদিদ্‌ নবাব হলেন। এবং নবাব হয়েই নিজেকে খেতাব দিলেন 'সুলতান বাজবাহাদুর' !

নবাবরা নিজেরাই নিজেদের এই যখন-খুশি-তখন আকছার খেতাব যে দেন, এই ব্যাপারটা আমার খুব মজার লাগে। আফ্রিকার মাসাই উপজাতির মানুষেরাও ইচ্ছেমতো যখন-তখন তাদের নিজেদের নাম বদলে দেয়। ধরো, যার

নাম রাম, তার যদি বেশিদিন 'রাম' থাকতে ইচ্ছে না করে তবে সে খুশিমতো 'শ্যাম' অথবা 'গোপাল' বা 'নেপাল' হয়ে যেতে পারে। তাদের সমাজে কেউই ঠেকায় না।

তবে এতে বেচারা পুলিশদের খুবই অসুবিধে হয়। 'রাম' এক গ্রামে চুরি করে অন্য গ্রামে গিয়ে তার নাম 'শ্যাম' করে দিলে কারোই বলার কিছু নেই। মাসাইরা যেমন নাম বদল করেন, তেমন নবাবেরাও খেতাবের পর খেতাব দিয়ে নিজেদের মহৎ অথবা নতুন করতে চেষ্টা করেছেন। কী মজা বলো তো ! নামটা নতুন হয়ে গেলে, মনে হয় জীবনটাও যেন নতুন হয়ে গেল। যেন ফিন্‌সে শুরু হল ! নবাবদেরও বোধহয় নিজেদের নতুন খেতাব নিজেরাই দিয়ে নিয়ে নবাবি শুরু করতে সুবিধে হয়। যেন মনে হয়, সবেমাত্র জন্ম হল।

মাণ্ডুর নবাব বাজবাহাদুর পর্যন্তই এসে যখন পৌঁছে গেলাম তখন ইতিহাসের কচকচি এবার থাক। চলো আমরা বাজবাহাদুর আর রূপমতীর মাণ্ডুতেই বরং ফিরে যাই। তাদের দুজনের গল্প শোনাই তোমাদের।

॥ ৪ ॥

বাজবাহাদুর রাজকার্যের চেয়ে নানারকম শখ ও সুখ নিয়েই বেশি মশগুল ছিলেন। বুদ্ধিমান লোক। একটাই জীবন। উপায় ছিল, তাই স্ফূর্তি করে কাটিয়ে দেওয়াই উচিত মনে করলেন। গান বাজনা নাচ এবং নানান আমোদপ্রমোদে দিন কাটাতেন তিনি। গোঁন্দদের রানি গণ্ডোয়ানার রানি দুর্গাবতীর হাতে যুদ্ধে বাজবাহাদুরের চরম হার হয়েছিল। তারপর থেকেই হেরো বাজবাহাদুর মাণ্ডুর বাইরে আর বিশেষ যেতেন না। পরাজয়ের দুঃখ ভুলতে দিনে দিনে গানবাজনা আর

লেখক সত্যজিৎ রায় কজন ?

লেখা তাঁর পুরো সময়ের কাজ নয়, কিন্তু যখনই লেখেন, যা-কিছু লেখেন—তা কেড়ে নেয় আমাদের পুরো মনোযোগ। লেখক হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনই চমক-জাগানো তাঁর রচনার বিষয় এবং স্বাদের বৈচিত্র্য। 'বাদশাহী আংটি' থেকে শুরু করে এ-বছর 'ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু পর্যন্ত' যে পঁচিশটি ছোটদের বই বেরিয়েছে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে, শুধু তার ওপর একবার চোখ বুলোলেই অবাক লাগে। মনে হয়, এ-সবই কি একজন স্রষ্টার রচনা ? সত্যিই যেন হিসেব মেলে না। যিনি লেখেন গোয়েন্দা ফেলুদার নানান রহস্যভেদের দুরন্ত সব বুদ্ধিদীপ্ত কাহিনী, তিনিই যে প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর মতো বিজ্ঞানীর নিত্য নতুন কাণ্ডকারখানার স্রষ্টা, মেলানো যায় না। আবার 'ফটিকচাঁদ' পড়লে মনে হয়, এ যেন তৃতীয় এক লেখকের উপন্যাস। শুধু কি এইটুকুই ? না। এর পরেও থেকে যায় 'পটলবাবু ফিল্মষ্টার', 'সেপ্টোপাসের খিদে', 'খগম' বা 'সমাদ্দারের চাবি'র মতো অবিস্মরণীয় সব গল্প—যা ছড়িয়ে রয়েছে 'এক ডজন গপ্পো' এবং 'আরো এক ডজন' বইতে।

সত্যজিৎ রায়ের বই

ফেলুদা-সিরিজ : হত্যাপুরী ৮·০০ ছিন্নমস্তার অভিশাপ ৮·০০ গোরস্থানে সাবধান ৮·০০ ফেলুদা এণ্ড কোং ১২·০০ জয় বাবা ফেলুনাথ ৮·০০ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৮·০০ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৮·০০ বাক্স রহস্য ৮·০০ সোনার কেল্লা ৮·০০ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৮·০০ বাদশাহী আংটি ১০·০০ যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে ৮·০০ টিনটোরেটোর যীশু ১০·০০ ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু ১২·০০

শঙ্কু-কাহিনী : স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু ৮·০০ মহাসংকটে শঙ্কু ৮·০০ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৮·০০ প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানার ১০·০০ শঙ্কু একাই ১০০ ১২·০০

গল্পগ্রন্থ : এক ডজন গপ্পো ১২·০০ আরো এক ডজন ১২·০০ আরো বারো ১২·০০ এবারো বারো ১২·০০

অনন্য উপন্যাস : ফটিকচাঁদ ১০·০০

স্মৃতি কাহিনী : যখন ছোট ছিলাম ১৫·০০

সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত সন্দেশ-পত্রিকার শ্রেষ্ঠ রচনা নিয়ে চিরকালীন সংকলন

সেরা সন্দেশ দাম ৬০·০০

নতুন পর্যায়ে 'সন্দেশ' পত্রিকার বয়স কুড়ি পেরিয়েছে। নিতান্ত একটি পত্রিকা তো নয়, আশ্চর্য রকমের সুন্দর আর সম্ভ্রান্ত একটি প্রতিষ্ঠান। বারবার পড়বার মতো কত-যে লেখা প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকায়, এবং বারবার দেখবার মতো কত ছবি তার ইয়ত্তা নেই। কুড়ি বছরের সেইসব লেখা আর ছবির থেকেই বেছে নিয়ে, ছেঁকে নিয়ে বার করা হল অসামান্য এই সংকলন—সেরা সন্দেশ। কী আছে সেরা সন্দেশে ? উত্তরে বলতে হয় কী নেই ? রবীন্দ্রনাথের নাটিকা, শরদিন্দুর সদাশিবের কাণ্ডকাহিনী, তারাশঙ্করের গল্প, অজিত দত্তের ছড়া, সুখলতা রাওয়ের কবিতা, ক্ষিতিমোহন সেনের চিঠি পরিমল গোস্বামীর প্রবন্ধ—এমন সব দুর্লভ লেখার পাশাপাশি এ-যুগের প্রবীণ আর নবীন প্রায় প্রত্যেকের সৃষ্টি নিয়েই এই দারুণ বৈচিত্র্যময় সংকলন। শুধু গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-ছড়া-শিকারকাহিনী-গোয়েন্দা উপাখ্যান—রূপকথা-অ্যাডভেঞ্চার-ইতিহাস বা বিজ্ঞানই নয়, ম্যাজিক-ধাঁধা-হেঁয়ালি-ছবি আর শব্দের খেলা, এমন-কি কার্টুনও বাদ যায়নি। সেরা সন্দেশ সাজিয়ে দেবার কাজটা করেছেন, সত্যজিৎ রায়। অজস্র নতুন ছবি এঁকেছেন। তিনি এই সংকলনটির জন্য।

ম্যাপলিথো কাগজ, লাইনোয় ছাপা, আর্ট পেপারে প্লাস্টিক ফিনিশ জ্যাকেট, রঙীন পুস্তানি, কাপড়ে শক্ত বাঁধাই, সত্যজিৎ রায়ের আঁকা প্রায় দুশো ছবি ও প্রচ্ছদপট। পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণে নতুন লেখা ও লেখক পরিচিতি।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

আমোদপ্রমোদে আরও বেশি করে ডুবিয়ে দিলেন নিজেকে তিনি। তাঁর এইরকম অরক্ষিত ও অপ্রস্তুত অবস্থাতে আধম্ খান—আগ্রার সুলতান আকবরের সেনাপতি—মালোয়াঁ আক্রমণ করলেন, পনেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে।

মাণ্ডু থেকে বাধ্য হয়েই যুদ্ধ করতে নেমে এলেন বাজবাহাদুর। কিন্তু শারাংপুরের যুদ্ধে গো-হারা হেরেএকেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সুলতান বাজবাহাদুরের মালোয়াঁর সেনাবাহিনী। বাজবাহাদুর বেগতিক দেখে নিজে পালিয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু আধম্ খাঁ মাণ্ডুতে এসে পড়লেন। রূপমতীর বড় বিপদ। আধম্ খাঁ অনেক চেষ্টা, ছলচাতুরি করেছিলেন রূপমতীকে পাবার জন্যে। কিন্তু রূপসী বন্দিনী রূপমতী তাঁকে বারবার ফিরিয়ে দিলেন। শেষে যখন দেখলেন যে, নিজের মান-ইজ্জত আর বাঁচানো যাবে না, তখন তিনি জহরব্রতে আত্মাহুতি দিলেন। সব শেষ হয়ে গেল। রাগ-রাগিণী, তাঁর আশ্চর্য রূপ, তাঁর দিঘল চোখদুটি, কোমর-ছাপানো চিকন চুল, তাঁরই সঙ্গে মুছে গেল তাঁর গলার অপরূপ মেঘমল্লারের সব আলাপ, তান, বিস্তার।

শারাংপুরে একটি ভাঙা কবর আছে। সেখানে লেখা আছে যে, ওটি নাকি রূপমতীর কবর। কিন্তু ঐতিহাসিকরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। বলেন, এ রূপমতী অন্য কোনো রূপমতী হবে। মাণ্ডুর পদ্মবালা একজনই। দুজন রূপমতী হয়নি। হবেও না কখনও।

রূপমতীকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক, যেমন ফিরিস্তা বলেছেন যে, তিনি বিখ্যাত বাইজি ছিলেন। শারাংপুরের মেয়ে তিনি। মাসির-উল্-উম্‌রা এবং আহমদ-উল্-উমারির লেখকরা বলেছেন যে, তিনি তওয়ায়েফ্ ছিলেন। মানে নাচেওয়ালি। নিজামুদ্দিন আহমদ, তাবাকুয়াত-ই-আক্‌বরির লেখক রূপমতীকে বাজবাহাদুরের স্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মূল পরিচয় সম্বন্ধে যিনি যাই-ই বলুন না কেন, তাঁর সুকণ্ঠ, তাঁর রূপ ও গুণ, রাগসংগীত সম্বন্ধে তাঁর অশেষ জ্ঞান, বাজবাহাদুরের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং তাঁর সতীত্বের প্রশংসা করেছেন প্রত্যেকেই।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন যে, রূপমতী হিন্দিতে কবিতাও লিখতেন। খুব ভাল শিকারি ছিলেন তিনি। এবং দারুণ অশ্বারোহীও ছিলেন। তাঁর অসীম সাহসের কথাও তাঁরা বলেছেন। শারীরিক সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তিনি শিকারে। আর মনের সাহসের পরিচয়, আধম্ খাঁর বন্দী হয়ে থাকার সময়। শারীরিক সাহস শস্তা সাহস, যে-কেউই তা দেখাতে পারে। মনের সাহসে যে সাহসী, সেই-ই তো সত্যিকারের সাহসী।

বাজবাহাদুর, শারাংপুর থেকে মাইল-কুড়ি দূরে আকবরের সেনাপতি আধম্ খাঁর সঙ্গে যে সাংঘাতিক যুদ্ধ হয়, তাতে হেরে গেলেন। মালোয়াঁর বহু সৈন্য মারা গেল সে যুদ্ধে। পনেরোশো একষট্টির সাতাশে মার্চে সেই যুদ্ধ হয়েছিল। খান্দেশের দিকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন বাজবাহাদুর।

খারাপ লাগে এই কথা ভাবলে যে, কেমন পুরুষ ছিলেন তিনি? নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলেন রূপমতীর কথা একবারও না ভেবে? তাঁর সব ধনরত্ন তখন আয়ত্তে এল আধম্ খাঁর। বাজবাহাদুর যুদ্ধে যাবার আগে তাঁর একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে বলে গেলেন যে, যদি তিনি যুদ্ধে হেরে যান তবে তাঁর হারেমের সব মেয়েদের যেন মেরে ফেলা হয়; মুঘল সৈন্যরা মাণ্ডুতে এসে পৌঁছবার আগেই।

এও বা কেমন কথা হল?

তাঁর হারের খবর পাওয়ামাত্র তাঁর আজ্ঞা, তাঁর আস্থাভাজন অনুচরেরা পালন করলেন। প্রায় সব মেয়েদেরই জাহাজ মেহাল এবং অন্যত্র যেখানে যেখানে তাঁরা থাকতেন সেখানে সেখানেই নাকি মেরে ফেলা হয়। অনেকে আহত হলেন, প্রাণে মরলেন না। রূপমতীও নাকি সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিলেন। আধম খাঁ যাঁদের পেলেন তাঁদেরই ধরে নিয়ে গেলেন এবং চর পাঠালেন রূপমতীকেও ধরে তাঁর কাছে আনতে।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন যে, রূপমতীকে প্রথমে তাঁর গুরু শেখ উমারের কাছে পাঠানো হয়েছিল, ওইখানে আধম খাঁ প্রায়ই গিয়ে রূপমতীর মন জয় করার চেষ্টা করতেন। এইখানেই তাঁর ক্ষতগুলির চিকিৎসা হয় এবং তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। যতদিন ক্ষত ছিল, অজুহাতও ছিল। যখন আর কোনো অজুহাত রইল না তখন আধম খাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তখন একদিন কর্পূর, জাফরান আর আতরমেশানো জলে ভাল করে চান করে সুন্দর করে সেজে নিজে হাতে বিষ খেলেন, নিজের জীবন শেষ করতে, হিন্দুস্তাঁর সেরা সুন্দরী রূপমতী!

পনেরোশো একষট্টির সাতাশে এপ্রিল আকবর আগ্রা ছেড়ে শারাংপুরে এসে পৌঁছলেন মে মাসের তেরো তারিখে। মালোয়াঁর প্রশাসনের সব বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করে তিনি আগ্রাতে ফিরে গেলেন। এবং আধম্ খাঁকেও তারপর আগ্রাতে ডেকে

পাঠালেন। তার বদলে পীর মুহাম্মদ খাঁকে মালোয়াঁর সুবেদার করে পাঠালেন তিনি। এই সময়ে বাজবাহাদুর তাঁর ছত্রভঙ্গ বাহিনীকে একত্র করে আক্রমণ করেন পীর মুহাম্মদ্ খাঁকে। এবং মালোয়াঁ পুনরধিকার করলেন।

আকবর তখন আবদুল্লা খাঁ উজবেগ আর মুনিম খাঁকে পাঠালেন আগ্রা থেকে। বাজবাহাদুরের যুদ্ধের কপাল কখনওই ভাল ছিল না। আবার ছত্রভঙ্গ হল তাঁর সেনাবাহিনী। আবারও হেরে, জঙ্গলে পালিয়ে গেলেন তিনি। মালোয়াঁ আবারও মোগলদের অধীনে এল। আফগান বাজবাহাদুরের শেষ যুদ্ধের পর। অনেকে বলে, তারপর বাজবাহাদুর নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে শেষে আকবরেরই কাছে পনেরোশো সত্তরে আশ্রয় নিলেন। লোকে বলে যে, আকবরের দরবারের সংগীতজ্ঞদের মধ্যে, তখন মিঞা তানসেনেরই মতো বাজবাহাদুরও সেই দরবারের একজন সংগীতজ্ঞ, একজন বিশিষ্ট গায়ক হিসেবে ছিলেন। আগ্রাতেই, পনেরোশো পঁচানব্বুইতে মৃত্যু হয় তাঁর।

সাম্প্রতিককালের ঐতিহাসিকরা অবশ্য বলেন যে, রূপমতীর মৃত্যু হয়েছিল যেমন শারাংপুরে, বাজবাহাদুরেরও তাই। তাঁদের দুজনকেই একই সঙ্গে কবর দেওয়া হয় পাশাপাশি, শারাংপুরের এক মস্ত তালাওয়ের মধ্যের এক ছোট্ট দ্বীপে। এখন এই কবর নাকি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে।

আমাদের মন এই দ্বিতীয় কাহিনীকেই মানতে চায়। যে-রূপমতীকে ফেলে তিনি পালালেন, যে-রূপমতী আকবরের সেনাপতি আধম খাঁর অত্যাচারের ভয়ে বিষ খেয়ে জহরব্রত করলেন, সেই রূপমতীরই চোখের মণি হয়ে তিনিই আকবরের দরবারে গিয়ে আশ্রয় নিলেন তাঁর দরবারি গায়ক হিসেবে—একথা মেনে নিতে বড়ই লজ্জা হয়। বাজবাহাদুরকে আর ভালও লাগে না।

মাণ্ডুতে যদি তোমরা যাও, তবে বর্ষাকালে গেলেই সব চেয়ে ভাল হয়। মাণ্ডুর বর্ষার রূপের খ্যাতি আকবর এবং জাহাঙ্গির বার বার করেছেন। দিঘিতে দিঘিতে তখন কানায় কানায় জল। পদ্মপাতার মধ্যে জলপিপিদের খেলা। পাহাড়ে পাহাড়ে ঝরনার কুলকুল। নিমারের উপত্যকা তখন সবুজের সংজ্ঞা। চাপ-চাপ ঘাস, হিমেল মিষ্টি আমেজ চারদিকে।

একদিন জাহাজ মেহালের চাতালে, চবুতরায়, খিলানে, গম্বুজে, ঝরোকাতে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বলত। একতলা দোতলার সুইমিং পুলের সুগন্ধি জলে খেলা করত পৃথিবীর সেরা সুন্দরীরা। তখন দূর থেকে 'মুঞ্জ তালাও'য়ের পদ্মবনে ঢাকা জলরাশির উপর আলোর মালায় সেজে-থাকা জাহাজ মেহালকে সত্যিই মনে হত কোনো আনন্দের জাহাজই যেন ভেসে চলেছে কোনো দেবলোকের পানে। রাত গভীর হলে আফগানি রবাব আর সারেঙ্গির সঙ্গে রূপমতী মেঘমল্লারে আলাপ করতেন, বাজবাহাদুরের পাশে বসে থাকতেন। পারস্যদেশী গালচেতে মখমলমোড়া তাকিয়াতে হেলান দিয়ে। বাজবাহাদুরের আল্‌বোলার তামাকের গন্ধ, বর্ষারাতের মাণ্ডুর গায়ের গন্ধ, আর রূপমতীর শরীরের সুগন্ধের সঙ্গে মেঘমল্লারের আলাপ মিশে গিয়ে তখন জাহাজ মেহাল এক মেঘযান; দেবযানই হয়ে উঠত যেন।

বর্ষায় যদি নাও পারো যেতে, তবে যে-কোনো সময়েই যেও। তোমাদের কল্পনা দিয়ে বাকিটুকু ভরিয়ে নিও। ইতিহাসে তো কিছু তথ্য, কিছু ঘটনা, কিছু সন তারিখই থাকে মাত্র! বাকিটা, যে ইতিহাস পড়তে জানে, ভালবাসে, তাকে কল্পনা দিয়েই ভরিয়ে নিতে হয়। মানুষকে, বিধাতা কল্পনার মতো এমন দামি ঐশ্বর্য আর কীই-ই বা দিয়েছেন বলো?

॥ ৫ ॥

আহমেদ-উল্-উম্‌রি তুর্কোমান, মালোয়াঁর অনেক জায়গাতে গেছিলেন। তিনি বাজবাহাদুর আর রূপমতী সম্বন্ধে আলাদা একটি বইও লিখে গেছিলেন, পনেরোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে। তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছিলেন তিনি 'আশ্চর্য এক বিশ্বস্ততার কাহিনী'।

ওই সব বিদেশী পর্যটকরা তো কোথায় মালোয়াঁ, কোথায় মাণ্ডু তা জানতেন না। মোটামুটি শুনেছিলেন যে, হিন্দুস্তাঁর মধ্যভাগে বিন্ধ্যপর্বতের পিছনদিকের এক উঁচু মালভূমিতে মালোয়াঁ বলে এক রাজ্য ছিল। তখনকার পর্যটকেরা হিন্দুস্তাঁ সম্বন্ধে বলতে গেলেই বলতেন, যেমন এখনও সকলে বলেন 'বেনারসের ভোর, অযোধ্যার সন্ধে, আর মালোয়াঁর রাত'। সেই মালোয়াঁর রাজধানী ছিল সব দুর্গের সেরা দুর্গ। রেওয়া নদীর উপত্যকা থেকে সোজা কয়েক হাজার ফিট উঠে যাওয়া মালভূমির উপর থেকে যেন মাণ্ডু ঝুলে থাকত সেই উপত্যকাতে। তখনকার মানুষ যে-নদীকে রেওয়া বলে ডাকতেন, আজ তারই নাম নর্মদা। এবং রেওয়ার সেই উপত্যকাই নিমারের সমতলভূমি।

রূপমতী শুধু গাইয়েই ছিলেন না, ওঁর মতে তিনি খুব ভাল কবিও ছিলেন। তাঁর গান এবং কাব্যপ্রতিভায় বাজবাহাদুর এমনই মুগ্ধ ছিলেন যে, রূপমতীর অঙ্গুলিহেলনেই রাজ্যের যা কিছু কাজকর্মও হত মন্ত্রীদের মাধ্যমে। বাজবাহাদুর এ পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়ে যেন শুধু রূপমতীর গানবাজনার জগতেই বাস করতেন।

আহমেদ-উল্-উম্‌রি, তুর্কোমান যা লিখেছেন, তাতে জানা যায় যে, আধম খাঁ মাণ্ডুতে এসে রূপমতীকে পাবার চেষ্টাতে যখন সবরকম উপায়ই অবলম্বন করছেন, তখন রূপমতী একদিন ফুলওয়ালি সেজে মাণ্ডু থেকে পালিয়ে পাহাড় থেকে নেমে শারাংপুরের দিকে এগোতে লাগলেন। যেখানে তাঁর জন্ম, যেখানে কেটেছে তাঁর ছেলেবেলা, যেখানে আত্মীয়-পরিজন, সংগীতগুরু। প্রায় পৌঁছেও গেছিলেন। শারাংপুর থেকে তিনি যখন আর মাত্র কুড়ি মাইল দূরে তখন আধম খাঁর লোকজন, যারা খবরটা জানাজানি হওয়ামাত্রই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল রূপমতীকে ধরে আনার জন্যে, ধরে ফেলল রূপমতীকে। দ্বিতীয়বার মোগল আধম খাঁর খপ্পরে পড়লেন রূপমতী। তাঁকে ধরে আধম খাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তখন সেই মহীয়সী নারী, যাঁর চোখের মণি ছিলেন বাজবাহাদুর, শুধুই বাজবাহাদুর, মোগল সেনাপতিকে বললেন, 'আমি আপনার এই কার্যকলাপে বড়ই ক্লান্ত, বিরক্ত। আমাকে পাওয়ার আশা কোনোদিনও পুরবে না আপনার।'

তখন আধম খাঁ বললেন, 'ঠিক আছে। শুধু কথায় যখন কাজ হবে না, তখন অন্য উপায় দেখছি।'

রূপমতী যখন দেখলেন যে, পালাবার কোনো পথই আর খোলা নেই, বাঁচারও আশা নেই অধম আধম খাঁর হাত থেকে, তখন তিন দিন সময় চেয়ে নিলেন তিনি তাঁর কাছ থেকে এবং আধম খাঁর হারেমেই থাকতে বাধ্য হলেন।

হারেম থেকে আধম খাঁকে তিনি লিখে পাঠালেন, 'বিজয়ী সেনাপতি, আমি তো বিজিতা, আমার তো কোনো উপায়ই নেই আপনার আদেশ অমান্য করার ; কিন্তু তবুও জেনে নিন যে, আমার জীবনের একমাত্র গর্ব, আমার সম্মান, বাজবাহাদুরের সখী হিসেবেই।'

এই বার্তা যখন আধম খাঁর হাতে পড়ল তখন রসিক সেনাপতি লিখে পাঠালেন, 'আমি সাত রাজ্য জয় করেও হেরে গেলাম আপনার কাছে রূপমতী। জয়ী আপনিই। আমি আমার সব ধনসম্পত্তি, মানসম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দেব, মিটিয়ে দেব মৃত্যুর পরে আমার বেহেস্তে যাওয়ার সব সাধ, ছুঁড়ে ফেলব যা-কিছু কামনা বাসনা, আমার রণসাজ ; আপনি শুধু আমার হোন, হাসিমুখে, খুশিমনে। না করবেন না আপনি।'

আধম খাঁও রূপমতীর জন্য পাগল হয়ে গেলেন। তখন তাঁকে দেখে কে বলবে যে, তিনি এত বড় রণজয়ের পর একজন বিজেতা সেনাপতি! পাগলের মতো তিনি শুজ্জাত খানকে হুকুম করলেন মহল সাজাতে, আলোয়, ফুলে। হুকুম করলেন গন্ধ ওড়াতে, আতর ছড়াতে। আমির-ওমরাহদের কাছে সেই খুশির রাতের ভোজের দাওয়াতের খত্ গেল।

মাঝরাতে, বাজবাহাদুরের রাজসভার সবচেয়ে বড় গাইয়ে রাইচাঁদকে গাইতে হুকুম করলেন আধম খাঁ। রাইচাঁদ এবং অন্যান্যরা আফগানি রবাবের তারে আঙুল ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে গানের মধ্যে দিয়ে যেন মাণ্ডুর জখ্মি হৃদয়ের দিল্‌দর্দি কান্নাই ছড়িয়ে দিতে লাগলেন রাতের মাণ্ডুতে, যে-মালোয়াঁ রাতেরই জন্যে বিখ্যাত সেই মালোয়াঁরই রাজধানীতে।

গান ওঁরা গাইছিলেন মালবী ভাষায়। বলছিলেন, ওরে অত্যাচারী সেনাপতি, তোমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। এই শান্তির আর খুশির আর আনন্দের শহর তোমার এই অত্যাচার আর বেশিদিন সহ্য করবে না। আর কতদিন তুমি আমাদের এমনি করে কষ্ট দেবে? সব কষ্টেরই শেষ থাকে।

গান যখন শেষ হয়ে এল, রবাব থেমে গেল, সুরের রেশগুলি 'মুঞ্জ তালাও'-এর পদ্মবনের গভীরের নিটোল জলের সঙ্গে জলেরই মতো মিশে গেল, তখন আধম খাঁ সেই গানের মানে বুঝতে পারলেন আস্তে আস্তে। রাইচাঁদের উপরে গিয়ে সব দোষ পড়ল। খুশির দাওয়াত্ ভয় আর আতঙ্কের দোজখে পরিণত হল। এবং তাঁকে দেখে নেবেন বলে শাসালেন তিনি।

ভোরের আলো ফুটল রেওয়ার উপত্যকায়, পুবে। আধম খাঁ দাঁতে দাঁত চেপে ঠিক করলেন রূপমতীর সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করবেন সেদিনই।

রূপমতীর রাতও কম কষ্টে, কম চোখের জলে কাটেনি। তিনি বুঝলেন যে, বাজবাহাদুরের সঙ্গে দেখা তাঁর আর এ-জন্মে হবে না। পাজি আধম খাঁ এবার যে অন্যরকম ব্যবহার করবেন তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মনে মনে। তাঁর ভাগ্য আর সেই ভয়ার্ত-বেলাতে বিধাতার পায়ে নিজেকে নিবেদন করা ছাড়া আর কোনোই উপায় দেখলেন না তিনি। সে-রাতের ভোজের পরই আধম খাঁ তাঁর প্রাসাদকে রূপমতীকে গ্রহণের জন্যে তৈরি করতে বলে আদেশ দিয়েছিলেন।

রূপমতী স্নান সেরে সখীদের বললেন, তাঁকে, বাজবাহাদুরের সঙ্গে যেদিন তাঁর বিয়ে হয়েছিল, সেই বিয়ের সাজেই সাজিয়ে দিতে। ঠিক তেমনি করে। সেই পোশাক

বাজবাহাদুরই তাঁকে দিয়েছিলেন। সেজেগুজে, সুগন্ধি, উজ্‌লা হয়ে হাতে তিনি তাঁর বীণ তুলে নিলেন। এবং এমন সব বিধুর গান—তাঁর শেষের গান গাইতে লাগলেন যে, যারা তা শুনল তাদের বুক ভেঙে যেতে লাগল। গাইয়ে ছিলেন, তাই-ই বোধহয় শেষের গানের রেশ নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন দু কান ভরে, চিরদিনের জন্যে চলে যাওয়ার আগে।

গান গাওয়া শেষ হলে তাঁর শোবার ঘরে গিয়ে হিরেচুর বিষ খেলেন তিনি। আধম খাঁ ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন রূপমতীর ঘরের দরজায়। অনুমতি চাইছেন ভিতরে ঢোকার। সাড়াশব্দ না পেয়ে আধম খাঁ বিনা অনুমতিতেই যখন ঘরে ঢুকে এলেন তখন দেখলেন, রূপমতী তাঁর কালো চুল আর সব রূপ নিয়ে এলিয়ে পড়ে আছেন বিছানায়। শরীরটিই আছে শুধু, যে-রূপমতীর পদক্ষেপে, চাউনিতে, গলার স্বরে, অঙ্গুলি-হেলনে পাহাড় নদী মেঘ সমুদ্রও যেন চমকে উঠত, সে-রূপমতী তখন স্বর্গে। তাই-ই আমির খুস্‌রু বলেছিলেন যে, "আমি যখন থাকব না পৃথিবীতে তখন এই পৃথিবীর মাটিতে আমার কবরটি কোথায় আছে তা খুঁজতে যেও না তোমরা। কারণ প্রতিটি বিশ্বস্ত হৃদয়ই আমার স্মৃতিফলক।"

মাণ্ডু কিন্তু একবার যেও তোমরা। যে করেই হোক, যেও। প্লেনে যেতে পারো ইন্দোর, বম্বে অথবা দিল্লি থেকে। ট্রেনেও যেতে পারো। মোদ্দা কথা, যাতে করেই যাও, গোরুর গাড়িতে বা পায়ে হেঁটে হলেও, লক্ষ্মীটি, যেও।

মাণ্ডু না দেখলে ভারতবর্ষের এক বিশেষ 'আশ্চর্য' অদেখা থাকবে তোমাদের।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আড়িয়াদহ সর্বমঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা কী বলেন

একটুও চিৎকার-চেঁচামেচি নেই। একটা পাতা পড়লেও শব্দ শোনা যাবে, এমন চুপচাপ শান্ত পরিবেশ। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না, এটা মেয়েদের একটা স্কুল, কয়েকশো মেয়ে এখানে পড়াশোনা করে। প্রধানা শিক্ষিকা বেশ কড়া ধাতের। নিয়ম-শৃঙ্খলার বাইরে এক পা-ও হাঁটতে চান না। বললেন, "বেশির ভাগ স্কুল-কলেজে এখন নিয়ম-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। ছাত্রছাত্রীরা কখন আসছে, কখন যাচ্ছে, তার খোঁজখবর কেউ রাখে না।"

আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল। শিক্ষিকারা বেরিয়ে এলেন নিঃশব্দে, একটি মেয়েকেও বেরোতে দেখলাম না ক্লাস থেকে। হৈ-চৈ নেই, মেয়েদের জটলা নেই, সর্বত্র শৃঙ্খলার ছাপ।

১৯২১ সাল। দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। খ্রিস্টধর্মের প্রচারকরা তখন আড়িয়াদহ গ্রামে একটি প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামের কয়েকটি মেয়েকে ধর্মান্তরিত করে ওই স্কুলের ছাত্রী করে নেন তাঁরা। আড়িয়াদহের কয়েকজন যুবক এই ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখলেন না। তাঁরা বললেন, এটা ঘোর অন্যায়। জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ যুবকেরা এই স্কুলটিকে বন্ধ করে দিয়ে স্থানীয় অনাথ ভাণ্ডারের 'ক্ষেত্রনাথ স্মৃতি মন্দির ভবন'-এ প্রতিষ্ঠা করলেন আড়িয়াদহ সর্বমঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়। তখন এই স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৯, এখন ৮৫০। এই স্কুলে এখন যাঁরা পড়ান, তাঁদের অধিকাংশই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী।

স্কুলের পরীক্ষার ফল মোটামুটি ভাল। গত তিন বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল এইরকম : (১৯৮২) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৪। প্রথম বিভাগে ৪, দ্বিতীয় বিভাগ ২৩, বাদবাকি তৃতীয় বিভাগ। (১৯৮৩) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৫। প্রথম বিভাগে পাশ করেছিল ১১ জন ছাত্রী, দ্বিতীয় বিভাগ ৩০, অন্যরা তৃতীয় বিভাগ। (১৯৮৪) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৪। ১১ জন প্রথম বিভাগ, বাদবাকি দ্বিতীয় বিভাগ। ফেল নেই। এবারে পরীক্ষা দিচ্ছে ৭৮ জন। প্রধানা শিক্ষিকার ধারণা গতবারের তুলনায় এবার ফল অনেক ভাল হবে। প্রতি বছরই স্টার এবং ন্যাশনাল স্কলারশিপ থাকে। ১৯৭৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কলা বিভাগে এই স্কুলের ছাত্রী শ্রীমতী তপতী ভট্টাচার্য ৭ম স্থান অধিকার করেছিলেন। সংস্কৃতি ও খেলাধুলোর ক্ষেত্রে স্কুলের মেয়েরা বিভিন্ন সময় নানা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

বর্তমান প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী অপর্ণা মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ৩৫ বছরের। প্রায় তিন দশক আগে এই স্কুলে শিক্ষক-জীবন শুরু করেন। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়থেকে শিক্ষাতত্ত্বে প্রথম শ্রেণীতে এম-এ, স্কুলে পড়ান ইংরেজি।

কীভাবে তৈরি হলে পরীক্ষায় ভাল হতে পারে জানতে চাইলে প্রধানা শিক্ষিকা জানালেন, "এ-ব্যাপারে 'আনন্দমেলা'য় অনেক লেখা হয়েছে, নতুন করে আমি কী বলব বলুন। পরীক্ষায় ভাল করতে হলে পড়াশোনা করতে হবে, অবিরাম পড়াশোনা। আর, সেই পড়াশোনাকে ভালবাসতে হবে। যে পড়ার পিছনে প্রাণ নেই, মনের সংযোগ নেই, সে পড়া নিরর্থক। পরীক্ষায় ভাল ফল করবার জন্য চাই নিষ্ঠা, চাই একাগ্রতা, চাই ধৈর্য আর অধ্যবসায়।"

বাংলা, ইংরেজি আরও কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলে প্রধানা শিক্ষিকা বললেন, "আমার মতামত না ছেপে, বিষয়-শিক্ষিকাদের বক্তব্য ছাপতে পারলে ভাল হয়। কারণ আমি যা পড়াই না, সে-বিষয়ে কোনও মতামত না-দেওয়াই ভাল।" তাঁর সামনেই ছিলেন সহ প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী লতিকা মজুমদার। তাঁর বিষয় বাংলা। **কীভাবে তৈরি হলে বাংলায় ভাল ফল করা যাবে,** এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী মজুমদার বললেন, "বাংলাভাষাকে যে যত গুরুত্ব দিয়ে পড়বে, সে তত লাভবান হবে। বাংলা ভাষা ভালভাবে জানা থাকলে, ইংরেজির ভয়ও অনেকটা কেটে যাবে। ব্যাকরণ অংশকে অনেকেই অবহেলা করে সাহিত্য অংশের উপর গুরুত্ব দেয়। এটা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। ব্যাকরণ অংশ খুব ভালভাবে পড়া উচিত। বাংলা মাতৃভাষা হলেও বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর হাতের লেখা খুব খারাপ, পরীক্ষার খাতা দেখতে গিয়ে চোখ টনটন করে ওঠে। ভাল হাতের লেখা ভাল নম্বর তুলতে সাহায্য করে। পাঠ্যবই ছাড়াও নানা ধরনের বই, বিশেষত প্রবন্ধের বই এবং সংবাদপত্র পড়া উচিত।"

ইংরেজি সম্পর্কে এই বিষয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী শেফালিকা ঘোষাল জানালেন, "আমি এই স্কুলেরই ছাত্রী ছিলাম। আমাদের সময়ে এখনকার মতো এত ইংরেজি-ভীতি ছিল না। তার কারণ আমরা পড়তাম, ফাঁকি দিতাম না। এখনকার ছেলেমেয়েদের অনেকেরই তাদের পাঠ্যবই সম্পর্কে কোনও

ধারণা নেই। ধরুন, পাঠ্যবইয়ে হয়তো টেনিসনের কবিতা আছে। কবিতার নাম বলে আপনি যদি কবির নাম জিজ্ঞেস করেন, অনেকেই বলতে পারবে না। যদি-বা কবির নাম বলতে পারে, বলতে পারবে না কবিতার নাম। তার কারণ কী? কারণ আর কিছু নয়, পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ে না। পাঠ্যবইটা যদি খুঁটিয়ে পড়া থাকে, তার সঙ্গে যদি ভাল করে গ্রামার পড়া থাকে, ট্রানস্লেশন নিয়মিত অনুশীলন করা হয়, তাহলে ভয়ের কিছু নেই। পড়া এবং লেখা দুটোই দরকার। বানান ভুল না করা, ভাল হাতের লেখা, বিদেশী লেখকদের শ্রেষ্ঠ বইপত্র পড়া, এগুলো তো আছেই।"

অঙ্কের শিক্ষিকা শ্রীমতী শিপ্রা চক্রবর্তী **অঙ্ক সম্পর্কে** বেশি নয়, মাত্র তিনটি কথা বললেন। (১) অঙ্ক নিয়মিত অনুশীলন করা উচিত, অনুশীলন ছাড়া অঙ্কে ভাল নম্বর তোলা কঠিন। (২) অঙ্ককে অনেকে ভয় পায়। এটা ভাল নয়। অঙ্কের ভয় একবার মনে ঢুকে গেলে তাকে সরানো কঠিন। ভাল অঙ্ক জানা না-থাকলে পদে পদে ধাক্কা খেতে হবে। (৩) অঙ্ক মুখস্থ করে তারা, যারা নিতান্তই বোকা, কোনও রকমে টেনেটুনে পাশ করতে চায়। আসলে অঙ্ক বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়, মুখস্থ করে কোনও লাভ হয় না।

বিজ্ঞান সম্পর্কে জীবন-বিজ্ঞানের শিক্ষিকা শ্রীমতী কল্পনা ভট্টাচার্য ও ভৌত-বিজ্ঞানের শিক্ষিকা শ্রীমতী মালতী গুহ মোটামুটি একই কথা বললেন। তাঁদের বক্তব্য, "বিজ্ঞান কিছু-কিছু ক্ষেত্রে মুখস্থ করতে হয়, যেমন সংজ্ঞা। কিন্তু এই বিষয়টি অঙ্কের মতোই, মাথা পরিষ্কার রেখে বুদ্ধি-বিবেচনা করে বুঝতে হয়।"

ইতিহাস সম্পর্কে ইতিহাসের শিক্ষিকা শ্রীমতী অঞ্জলি রায় বললেন, "মানচিত্রের সাহায্যে পড়তে পারলে ভাল হয়। অনেকের ধারণা, ইতিহাসে পাতার পর পাতা লিখতে হয়। আবার কেউ কেউ মনে করে, আবোল-তাবোল যা-খুশি লিখেও ইতিহাসে ভাল নম্বর ওঠে। দুটো ধারণার কোনওটাই ঠিক নয়। ইতিহাসে বেশি লিখতে হয় না, কল্পনার রাজ্য তৈরি করারও কোনও সুযোগ নেই। উত্তর সহজ, সুন্দর এবং সংক্ষিপ্ত হলে ভাল নম্বর উঠবে।"

ভূগোল সম্পর্কে এই বিষয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী আরতি নায়েক বললেন, "ভূগোল নিয়ে আনন্দমেলায় যে-কথা বহুবার বলা হয়েছে, আমি সে-কথাই আবার বলছি। ভূগোলে ম্যাপ-অঙ্কন অত্যাবশ্যক। শুধু ম্যাপ আঁকলেই চলবে না, ম্যাপ দেখে ভূগোল পড়তে হবে। ভূগোলে ভাল নম্বর তোলার জন্য খবরের কাগজ এবং বিভিন্ন ধরনের, বিশেষভাবে ভূগোলসংক্রান্ত কাগজপত্রের সঙ্গে সংযোগ রাখা দরকার।"

কর্মশিক্ষা সম্পর্কে প্রধানা শিক্ষিকা যা বললেন, তা হল: বিষয় হিসেবে কর্মশিক্ষা ভাল। নম্বরও ওঠে মন্দ নয়। কিন্তু এই বিষয়টির প্রতি যতটা আগ্রহ ও যত্ন দেখানো উচিত, ছেলেমেয়েরা তা দেখায় না।

সবশেষে শ্রীমতী অপর্ণা মুখোপাধ্যায় 'আনন্দমেলা' সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানালেন। কয়েক বছরের বাঁধানো আনন্দমেলা আমাকে দেখিয়ে বললেন, "আনন্দমেলা আমার প্রিয় পত্রিকা বললে কম বলা হয়। আমি এই পত্রিকা এত ভালবাসি যে, এর প্রথম থেকে শেষ পাতাটি পর্যন্ত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ি।"

শ্যামলকান্তি দাশ

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

আড়িয়াদহ সর্বমঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়ে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল মধুপর্ণা রাহা সিক্স থেকে এই স্কুলে পড়ছে, আগে পড়ত গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলে। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ৯০০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছে ৭০৬। মধুপর্ণা ক্লাসে বরাবরই ফার্স্ট হয়।

মধুপর্ণা থাকে কামারহাটিতে। ওর বাবা শ্রীরবীন্দ্রনাথ রাহা জুট টেকনোলজিস্ট। মা শ্রীমতী বীথি রাহা আগে শিক্ষকতা করতেন, এখন মেয়ের পড়াশোনার দিকে সর্বদা নজর রাখেন।

দিনে ছ' সাত ঘণ্টা পড়ে মধুপর্ণা, ছুটির দিনে আর-একটু বেশি। পড়াশোনার শেষে ছোট্ট বোন নীলাঞ্জনাকে পড়ার বিষয় গল্প করে শোনাতে হয়। মধুপর্ণার গৃহশিক্ষক তিনজন। একজন ইংরেজি পড়ান, আর-একজন পড়ান বিজ্ঞান ও অঙ্ক, অন্যজন দেখিয়ে দেন বাংলা ও ইতিহাস।

অবসর-সময়ে কবিতা লেখে মধুপর্ণা। ছবি আঁকে। পাখির পালক জমানো তার

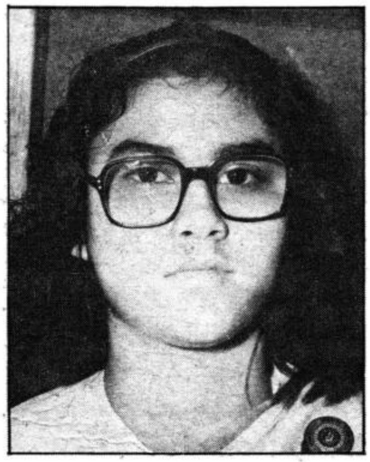

সবচেয়ে প্রিয় শখ। তার প্রিয় খেলা ক্রিকেট, প্রিয় ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রী। ভাল লাগে জীবনানন্দ দাশ আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা। ইদানীং যেসব বই পড়েছে, তার মধ্যে এই চারটে বই মধুপর্ণার খুব প্রিয়। (ক) পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, (খ) গোঁসাইবাগানের ভূত। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, (গ) গুগুনোগুম্বারের দেশে। বুদ্ধদেব গুহ, (ঘ) সোনার বিস্কুট। শেখর বসু।

ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞেস করায় মধুপর্ণা কোনও দ্বিধা না-করেই বলল, "এক্ষুনি কিছু বলতে চাই না। আগে মাধ্যমিকের ফলাফল, তারপর ভবিষ্যতের কথা ভাবব।"

পরীক্ষায় ভাল ফলের জন্য মধুপর্ণা ইংরেজিতে পি· কে· দে সরকার, পি· মাহাতো, এ· সি· সেন ও রেন-মার্টিনের বই পড়ে। বাংলায় পড়ে সুকুমার সেন ও হরিপদ চক্রবর্তীর সঙ্গে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বই। ভৌতবিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞানে যথাক্রমে সুখেন্দু মাইতি, রণজিৎ দাস এবং কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু ও অমূল্য ভূষণ চক্রবর্তীর বই তাকে খুব সাহায্য করে। অঙ্কে পড়ে কেশবচন্দ্র নাগ ও কে· পি বসুর বই। ইতিহাসে কিরণ চৌধুরী, নিমাইসাধন বসু ও প্রভাতাংশু মাইতির বই পড়ে। ভূগোলে পড়ে রায়-চক্রবর্তী, বসু-ভট্টাচার্য, লাহিড়ী-সেনগুপ্তের বই।

'আনন্দমেলা' মধুপর্ণার মতে, সত্যিই আনন্দের মেলা। এত আনন্দ আর জ্ঞানের খোরাক অন্য কোনও কাগজে নেই।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

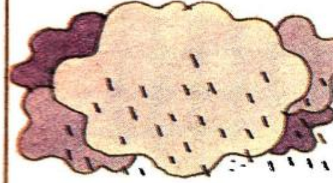

আকাশের মিস্তিরি

আকাশটা ফুটো বলে
বৃষ্টিটা পড়ে
টালি ফুটো হয়ে গেলে
মেরামত করে
তবে কেন আকাশের
মিস্তিরি নেই
পৃথিবীর যদি থাকে
আকাশেরও চাই

মহুয়া দাশগুপ্ত (বয়স ১১)

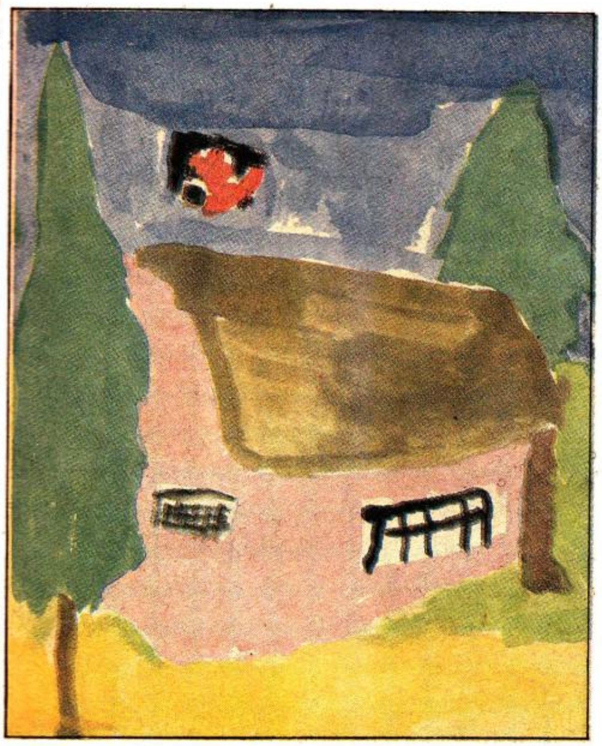

ছবি এঁকেছে **টিনা মুখোপাধ্যায়** (বয়স ৯)

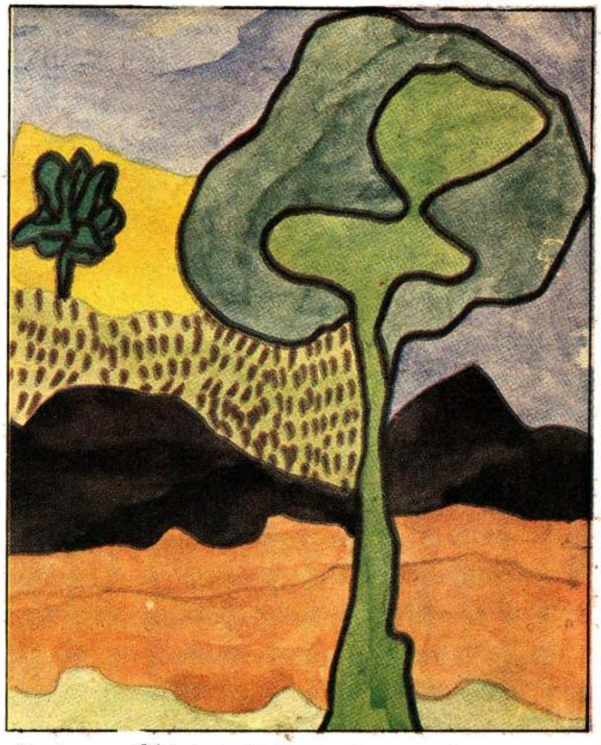

ছবি এঁকেছে **পিউয়া মুখোপাধ্যায়** (বয়স ১১)

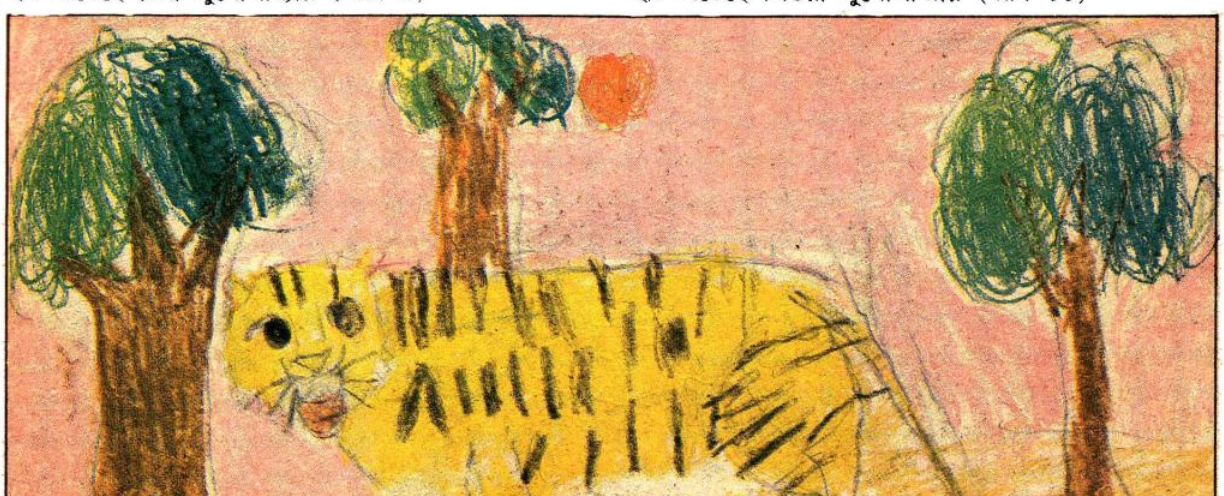

ছবি এঁকেছে **রূপকথা ভট্টাচার্য** (বয়স ৫)

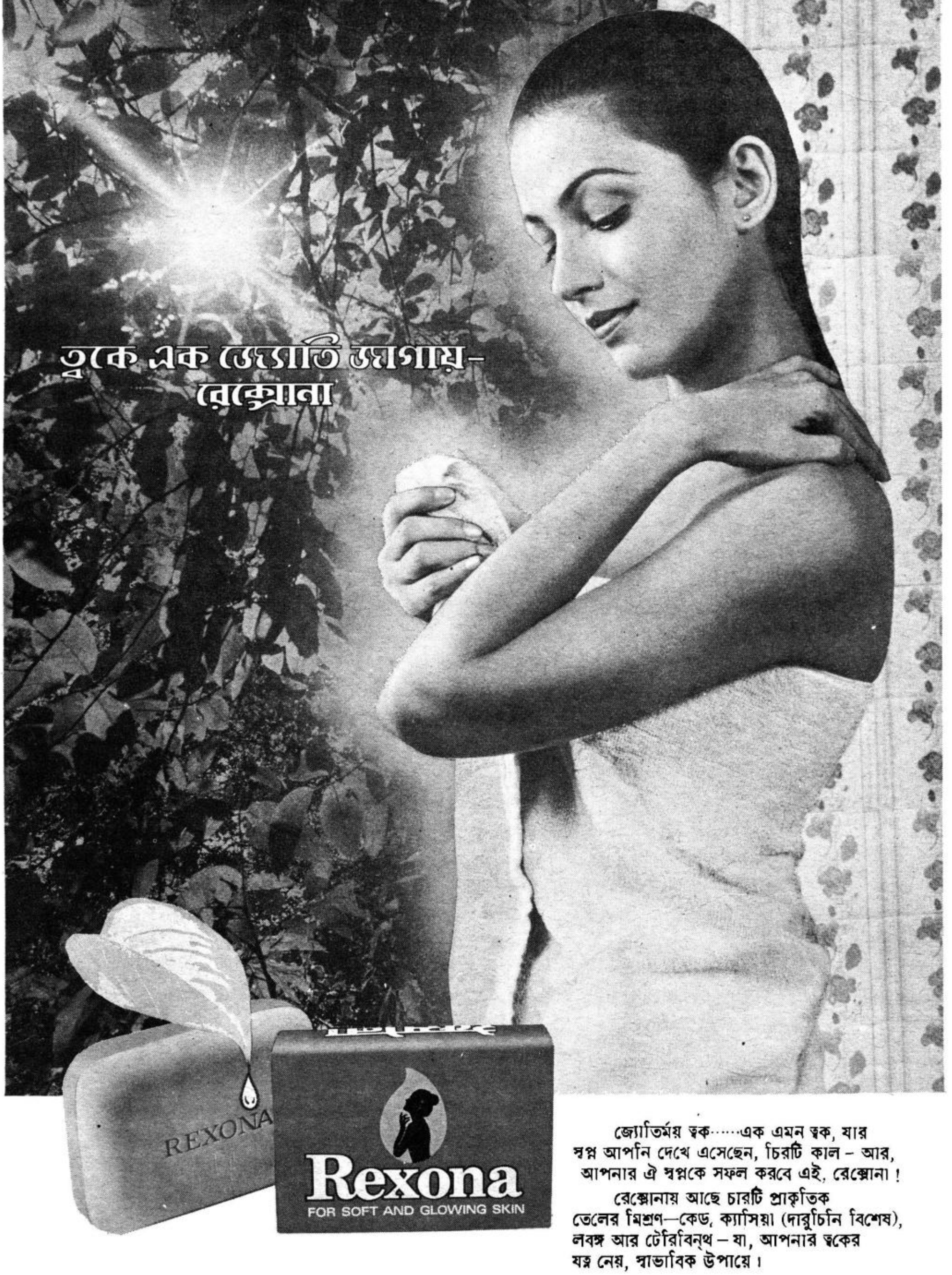

জ্যোতির্ময় ত্বক······এক এমন ত্বক, যার স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল – আর, আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা !

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ – যা, আপনার ত্বকের যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।

রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

নীলকান্তমণি রহস্য

সার আর্থার কোনান ডয়েল

বড়দিনের ঠিক দুদিন পরে সকালের দিকে আমি শার্লক হোম্‌সের বাসায় গেলুম। হোম্‌সকে বড়দিনের প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানাবার জন্যেই আমার যাওয়া। গায়ে একটা টকটকে লাল রঙের ড্রেসিং-গাউন চাপিয়ে হোম্‌স সোফায় বসে ছিল। সোফার ডান ধারে হাতের কাছে তার পাইপগুলো পর পর সারবন্দী ভাবে সাজিয়ে রাখা। আর যে সোফাটায় সে বসে ছিল তার চারধারে আজকের প্রায় সব কটা খবরের কাগজ মেজের কার্পেটের ওপর এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। সোফার কাছেই একটা কাঠের চেয়ার। সেই চেয়ারের ঠেসান দেবার উঁচু জায়গাটা থেকে বহু পুরনো ধুলো-পড়া ফাট-ধরা শক্ত একটা ফেল্ট হ্যাট ঝোলানো। চেয়ারটার বসবার জায়গায় ফরসেপ আর লেন্স রাখা আছে। আমি বুঝতে পারলুম যে, খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই ওই টুপিটাকে ওইখানে ওইভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

"ব্যস্ত রয়েছ দেখছি। কাজে বাধা দিলুম মনে হচ্ছে," আমি বললুম।

"মোটেই নয়। উলটে তোমার সঙ্গে এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলতে পারব ভেবে ভাল লাগছে।"

আঙুল দিয়ে টুপিটা দেখিয়ে হোম্‌স আমাকে বললে, "এ ব্যাপারটা অবশ্য যাকে বলে জলের মতো সোজা। তবে কি জানো, কয়েকটা পয়েন্ট আছে, সেগুলো যে শুধু ইন্টারেস্টিং তাই নয়, তার থেকে অনেক কিছু শেখবারও আছে।"

আমি একটা আরাম-কেদারা ঘরের জ্বলন্ত চুল্লির গনগনে আগুনের কাছে টেনে নিয়ে বসে হাত-পা গরম করতে লাগলুম। বাইরে সাংঘাতিক বরফ পড়ছে। জানলার সব শার্শি পুরু বরফে একেবারে ঢেকে গেছে।

আমি বললুম, "দেখে যদিও মনে হচ্ছে খুবই সাধারণ একটা টুপি তবু আমি জোর করে বলতে পারি যে, এই টুপিটার সঙ্গে কোনও রহস্যময় ঘটনার যোগ আছে। আর এই টুপির সূত্র ধরেই তুমি সেই রহস্যের জাল ছিঁড়ে ফেলে অপরাধীকে ধরে ফেলবে।"

"আরে না, না। এটার সঙ্গে কোনও অপরাধের যোগাযোগ নেই," শার্লক হোম্‌স হাসতে হাসতে বললে। "এটাকে বলতে পারো একটা আজব কাণ্ড। দেখো, মাত্র কয়েক মাইল জায়গার মধ্যে চল্লিশ লক্ষ লোক যদি সদা সর্বদাই গুঁতোগুঁতি ধাক্কাধাক্কি করে তাহলে এমন কিছু-কিছু উদ্ভট ঘটনা ঘটতেই পারে যা সাধারণ বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই যে লণ্ডনে এত লোক সারাদিন কাজে-কর্মে ঘোরাঘুরি দৌড়োদৌড়ি করছে, কখনও আনন্দে হৈ-চৈ করছে কখনও গোলমাল করছে—এই সব কাণ্ড-কারখানার মাঝখানে এমন ঘটনা ঘটা খুবই সম্ভব যা ভীষণ রকম অস্বাভাবিক মনে হলেও তাকে কোনও ভাবেই অপরাধমূলক ব্যাপার বা ক্রাইম বলা যায় না।"

"তা যা বলেছ। সত্যি কথা বলতে গেলে শেষ যে ছটা তদন্তের কথা আমার ডায়েরিতে লেখা তার মধ্যে তিনটে তো আইনের চোখে যাকে অপরাধ বলা যায় সে রকম কোনও ঘটনাই নয়," আমি বললুম।

"খুবই ঠিক কথা। তুমি আইরিন অ্যাডলারের কাগজপত্র, মিস মেরি সাদারল্যাণ্ড আর ওই যেটাকে তুমি 'ওষ্ঠবক্র রহস্য' নাম দিয়েছ, সেগুলোর কথা বলছ তো? আমার বিশ্বাস যে এই টুপির ব্যাপারটাও ওই রকমেরই একটা 'নির্দোষ' ধরনের কাণ্ড হবে। ...তুমি পুলিশ কমিশনার পিটারসনকে চেনো তো?"

"হ্যাঁ, চিনি বইকী।"

"এটা ওঁর সম্পত্তি।"

"এই টুপিটা পিটারসনের?"

"না, না। এই টুপিটা পিটারসন পেয়েছে। টুপির মালিক যে কে সেটা অবশ্য আমরা এখনও জানতে পারিনি। আমি বলি কী, এটাকে একটা ছেঁড়া-ফাটা টুপি হিসেবে না দেখে একটা ধাঁধা বা সমস্যা হিসেবে দেখো। আচ্ছা, প্রথম কথা হল এটা এখানে এল কী করে? বড়দিনের দিন ভোরে এই টুপিটা আর একটা বেশ মোটাসোটা নধরকান্তি হাঁস আমার কাছে আসে। সেই হাঁসটা অবশ্য এখন পিটারসনের রান্নাঘরে হাঁড়িতে ফুটছে। অল্প কথায় ব্যাপারটা এই রকম। পিটারসনকে তুমি তো জানো। বেশ সৎ, পরিশ্রমী লোক। বড়দিনের দিন ভোর চারটে নাগাদ সে টটেনহ্যাম কোর্ট রোড ধরে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ রাস্তার গ্যাসের আলোয় তার নজরে পড়ল যে, একজন বেশ লম্বা লোক সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তার আগে হেঁটে চলেছে। লোকটির পিঠে একটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হাঁস ঝোলানো। গুজ স্ট্রিটের কাছাকাছি যখন এসে পড়েছে তখন পিটারসন দেখলে যে ওই লোকটির সঙ্গে একদল গুণ্ডাজাতীয় লোকের কথা-কাটাকাটি হচ্ছে। হঠাৎ গুণ্ডাদলের একজন ধাক্কা মেরে ঐ লোকটির টুপিটা ফেলে দিলে। তখন লোকটি তার হাতের লাঠিটা বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে শুরু করলে। আর তার ফলে ওইখানে একটা দোকানের শো-কেসের কাঁচ লাঠির ঘায়ে ভেঙে যায়। এই সব দেখে পিটারসন লোকটিকে ওই গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সেই দিকে দৌড়ে যায়। কিন্তু মজা হল এই যে, একজন পুলিশের পোশাক-পরা লোককে ছুটে আসতে দেখে আর দোকানের কাঁচ ভেঙে ফেলার জন্যে ওই লোকটি ভয় পেয়ে তার কাঁধের হাঁসটিকে ওইখানে ফেলে দিয়ে একটা গলির ভেতরে ছুটে পালায়। ওইখানে এত সরু সরু গলি আছে যে সমস্ত পাড়াটা যেন একটা গোলকধাঁধা। পিটারসনকে ছুটে আসতে দেখে ইতিমধ্যে ওই গুণ্ডাগুলোও পিঠটান দেয়। তাই রঙ্গমঞ্চে পৌঁছে পিটারসন এই টুপিটা আর সেই হাঁসটাকে পড়ে থাকতে দেখে।"

"পিটারসন নিশ্চয় টুপি আর হাঁসটা মালিকের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসে ?"

"না হে, না। আসল গোলমালটা তো সেইখানেই। হাঁসটার বাঁ পায়ে অবশ্য একটা কার্ড আটকানো ছিল। তাতে লেখা, মিসেস হেনরি বেকারকে। আর টুপিটার ভেতরে এইচ বি এই দুটি অক্ষর লেখা ছিল। কিন্তু মুশকিল কী জানো ? লণ্ডন শহরে অন্তত হাজার খানেক বেকার পদবির লোক আছে। তাদের মধ্যে আবার খুব কম হলেও শ'খানেক লোকের নাম হেনরি। সুতরাং আসল মালিককে খুঁজে বের করে মাল ফেরত দেওয়া মোটেই সোজা কথা নয়।"

"পিটারসন তখন কী করলে ?"

"সেই দিনই সকালে সে হাঁস আর টুপিটা নিয়ে আমার কাছে এসে হাজির। পিটারসন জানে যে, যে-কোনও রকম সমস্যার সমাধান করতে আমার খুব ভাল লাগে। তুমি আসবার একটু আগে পর্যন্ত হাঁসটা আমার জিম্মায় ছিল। আমার মনে হল যে আর বোধহয় ওই হাঁসটা রাখা ঠিক হবে না। ওটাকে এবার রান্নাঘরে পাঠানোই উচিত। তাই যেহেতু পিটারসন ওটাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল সেই ওটার সদ্‌গতি করছে, আর আমি অপরিচিত সেই লোকটির টুপি নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, যদি কোনও কিছু করা যায়।"

"কিন্তু টুপি আর হাঁসের মালিক কি খবরের কাগজে কোনও বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দেননি ?"

"না ?"

"তাহলে কোন্ সূত্র ধরে তুমি তার সন্ধান পাবে বলে আশা করছ ?"

"যেটুকু তথ্য বিচার-বিবেচনা করে বের করতে পারি।"

"এই টুপিটা থেকে ?"

"নিশ্চয়ই।"

"যাহ্। তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ। এই ছেঁড়া-ফাটা টুপিটা থেকে কী তথ্য তুমি পাবে বলে আশা করো ?"

"তুমি তো আমার কাজের ধরন জানো। এই নাও লেন্স। তুমি নিজে পরীক্ষা করে দেখো এটা থেকে এর মালিক সম্বন্ধে কী কী খবর জানতে পারো।"

একরকম বাধ্য হয়েই আমি টুপিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলুম। খুবই সাধারণ একটা গোল কালো টুপি। টুপিটা অনেক দিন ব্যবহার করা হয়েছে। প্রায় জরাজীর্ণ অবস্থা। টুপিটার ভেতরে লাল রঙের সিল্কের কাপড়ের অস্তর। তবে রঙটা প্রায় উঠেই গেছে। টুপিটার ভেতরে কোনও কোম্পানির নাম নেই। তবে হোম্‌স যেরকম বলেছিল একদিকে এইচ বি হরফদুটো লেখা। টুপিটার দুদিকে ফুটো করা আছে। বোঝা যায় ওখানে চামড়ার সরু পটি লাগানো ছিল। পটিটা ছিঁড়ে গেছে। টুপিটায় ধুলো জমে রয়েছে। রঙ চটে গেছে। বেশ কয়েক জায়গায় ফাট ধরেছে। কালি লাগিয়ে রঙচটা জায়গাগুলোকে কালো করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

টুপিটা ফেরত দিয়ে আমি বললুম যে, কোনও সূত্রই আমার চোখে পড়েনি।

"ও কী বলছ! তোমার চোখের সামনেই সব কিছু রয়েছে। গোলমালটা কী হচ্ছে জানো, তুমি যা দেখছ তার থেকে কোনও সিদ্ধান্ত করতে পারছ না। আসলে তোমার এই পারছি না পারব না মনোভাবের জন্যেই তুমি ব্যাপারটা ধরতে পারছ না।"

"বেশ, আমি না হয় পারছি না, তুমি কী বুঝেছ সেটাই বলো শুনি।"

হোম্‌স টুপিটা তুলে নিলে। তারপর সেটার দিকে বেশ খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এই টুপিটা থেকে যত কথা জানতে পারা উচিত ছিল ততটা হয়তো জানা যাবে না। তবে কতকগুলো ব্যাপার বেশ স্পষ্ট। আর কতকগুলো ব্যাপার ঠিক ততটা পরিষ্কার না হলেও মোটামুটিভাবে যে ঠিক তা একরকম জোর করেই বলা যায়। যেমন ধরো, লোকটি বেশ বুদ্ধিমান। বছর তিনেক আগে পর্যন্ত সে বেশ পয়সাওলা লোকই ছিল। তবে এখন তার টাকা-পয়সার বেশ টানাটানি যাচ্ছে। লোকটি যাকে বলে বেশ হুঁশিয়ার। মানে সে যখন কোনও কাজ করে তখন বেশ ভেবেচিন্তেই কাজ করে। তবে এখন সে কিছুটা বেহিসেবি হয়ে পড়েছে। তার এই টাকা-পয়সার টানাটানি আর বেহিসেবি ভাব দেখে আমার মনে হচ্ছে যে তার স্বভাবও খারাপ হয়েছে। আর সেই কারণেও বোধহয় তার স্ত্রীর সঙ্গে বেশ ঝগড়াঝাঁটি চলছে।"

"হোম্‌স !"

আমার কথা গ্রাহ্য না করে হোম্‌স বলে চলল, "তবে লোকটি বেশ রাশভারী প্রকৃতির। অলস। নড়াচড়া করতে পছন্দ করে না। কোথাও বিশেষ যায় না। শরীরও এখন খুব আর শক্ত-সমর্থ নেই। লোকটি মাঝবয়সী। অল্প কিছুদিন আগে চুল কেটেছে। মাথায় লাইম ক্রিম মাখে। বলতে ভুলে গেছি, চুলে পাক ধরেছে। টুপিটা নিরীক্ষণ করে মোটামুটিভাবে এই কটা কথা জোর করে বলা যায়। আর একটা কথাও বলতে পারি। খুব সম্ভবত ওর বাড়িতে গ্যাসের লাইন নেই।"

"তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ ?"

"মোটেই নয়। এই যে কথাগুলো তোমাকে বললুম তারপরও কি তুমি ব্যাপারটা ধরতে পারছ না ?"

"এ-কথা হয়তো ঠিক যে আমি একটা নিরেট বোকা। কিন্তু বিশ্বাস করো তোমার কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই ধরতে পারছি না। যেমন ধরো, কী করে তুমি বুঝলে যে লোকটি বেশ বুদ্ধিমান।"

হোম্‌স টুপিটা তার মাথার ওপর বসালে। টুপিটা তার ভুরু পর্যন্ত ঢেকে দিল।

"দেখো, এটা হচ্ছে আকারের কথা। যার মাথায় এতখানি ব্রেন আছে সে আর যাই হোক বোকা নয়।"

"লোকটির অবস্থা যে খারাপ যাচ্ছে এটা জানলে কী করে ?"

"এই টুপিটা প্রায় বছর-তিনেকের পুরনো। আর সেইজন্যেই টুপিটার ধারগুলো কুঁচকে গেছে। টুপিটা বেশ দামি। ভাল করে লক্ষ করলে দেখবে যে, টুপিটার অস্তরের কাপড়টাও বেশ দামি। শুধু তাই নয়, টুপিটার বাইরে যে সিল্কের বেড়টা দেওয়া আছে সেটাও খুব দামি ফিতে। ভদ্রলোক বছর-তিনেক আগে এই দামি টুপিটা কিনেছিলেন। এখন টুপিটা প্রায় ফেলে দেবার মতো অবস্থায় এসেছে, তবুও তিনি টুপিটা বদলাননি। এর থেকে অনুমান করা শক্ত নয় যে, তার অবস্থা ভাল যাচ্ছে না।"

"হ্যাঁ, এখন অবশ্য মনে হচ্ছে যে তুমি যা বলছ তা হয়তো ঠিকই। তবে লোকটি আগে বেশ গোছালো হুঁশিয়ার ধরনের ছিল, আর এখন খানিকটা বেহিসেবি হয়েছে, এ-কথা তুমি জানলে কী করে?"

শার্লক হোম্‌স হেসে উঠল। "তিনি যে একসময়ে হুঁশিয়ার লোক ছিলেন তার প্রমাণ হল এইটে," বলে সে টুপিটার দুপাশে দুটো চাকতি আর আঙটা দেখালে। এই জিনিসটা টুপির সঙ্গে লাগানো থাকে না। এটা ফরমাশ দিয়ে করাতে হয়। এটার সঙ্গে একটা পটি লাগানো থাকে সেটা চিবুকের সঙ্গে লেগে থাকে। হাওয়ার চোটে টুপিটা যাতে মাথা থেকে উড়ে না যায় সেইজন্যে লোকটি এটা ফরমাশ দিয়ে তৈরি করিয়েছিল। এর থেকেই বোঝা যায় যে, লোকটি বেশ ভেবেচিন্তে সব কাজ করত। কিন্তু দেখো, এই ইলাস্টিকের পটিটা ছিঁড়ে যাবার পরে আর নতুন পটি লাগানো হয়নি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ওই বিবেচনা করে কাজ করার অভ্যেসটা তার চলে গেছে। কিন্তু আবার উলটো দিক দিয়ে দেখ টুপিটার যেখানে-যেখানে ফেটে বা ছিঁড়ে গেছে, সেখানে কালো কালি লাগানো, যাতে করে কারও নজরে না পড়ে। একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে যে, অবস্থা পড়ে গেলেও ওর আত্মসম্মান বোধ নষ্ট হয়নি।"

"হুঁ। তোমার বিশ্লেষণ যে নির্ভুল তা মানতেই হয়।"

"আর লোকটি যে মাঝবয়সী, তার চুলে পাক ধরেছে, দু-চারদিন আগে চুল কেটেছে আর চুলে লাইম ক্রিম লাগায়, এসব কথাগুলো টুপিটার অস্তরটা দেখলেই বোঝা যায়। লেন্স দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে নাপিতের কাঁচিতে কাটা ছোট-ছোট চুল অস্তরের সঙ্গে একেবারে আটকে আছে যেন আঠা দিয়ে জোড়া। আর টুপিটা শুঁকলেই লাইম ক্রিমের গন্ধ পাবে। তাছাড়া টুপিটায় যে ধুলো লেগে রয়েছে তা রাস্তার নোংরা ধুলো নয়। এই ধরনের হলদে মোটা দানার ধুলো ঘর-বাড়ির ভেতরেই হয়। এর মানে হল টুপিটা বহুদিন ঘরের ভেতরে টাঙানো ছিল। আর টুপির ভেতরে লক্ষ করলে দেখবে ঘামের দাগ পড়ে গেছে। সুতরাং টুপির মালিকের মাথা ভীষণ ঘামে। আর এই ভীষণভাবে মাথা ঘেমে যাওয়াটা আর যাই হোক ভাল স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।"

"বেশ, তা নাহয় হল। কিন্তু ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলছে এ-কথাটা বুঝলে কী করে?"

"দেখতেই পাচ্ছ টুপিটায় কী পরিমাণ ধুলো জমেছে। তার মানে কেউ ওটাকে বুরুশ করেনি। কোনও লোক যখন ওই রকম ধুলোপড়া টুপি পরে বাড়ি থেকে বের হয় তখন বুঝতে হবে যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুবই রাগারাগি চলছে।"

"কিন্তু এও তো হতে পারে যে, লোকটি বিয়েই করেনি।"

"তা কী করে হবে? মনে নেই হাঁসটার পায়ে আটকানো কার্ডটায় কী লেখা ছিল। মিঃ বেকার নিশ্চয়ই তার স্ত্রীকে খুশি করবার জন্যে ওই মোটাসোটা হাঁসটা কিনেছিল।"

"তোমার তো দেখছি সব প্রশ্নের জবাবই তৈরি আছে। কিন্তু ওর বাড়িতে যে গ্যাস লাইন নেই সে কথা তুমি জানলে কী করে?"

"একটা বা দুটো চর্বির দাগ যে-কোনও কারণেই হতে পারে। কিন্তু টুপিটার পাঁচ পাঁচ জায়গায় চর্বির দাগ থেকে বুঝলুম যে লোকটি প্রায়ই জ্বলন্ত চর্বির কাছাকাছি আসে। আর একটু ভাবতেই উত্তরটা পেয়ে গেলুম। রাত্তিরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার সময় তার এক হাতে টুপি আর অন্য হাতে মোমবাতি থাকে। গ্যাস থেকে এই ধরনের চর্বির দাগ পড়ে না। ...কী, এখন খুশি তো?"

"তোমার এই বিশ্লেষণ বেশ তাক-লাগানো বটে। তবে তুমি নিজেই বললে যে এ ঘটনাটার সঙ্গে কোনও ক্রাইম বা অপরাধের যোগ নেই। আর এই হাঁসটা ছাড়ানো ছাড়া কোনও লোকেরই কোনও ক্ষতি হয়নি। তাই তোমার এত বুদ্ধি বৃথাই খরচ হল," আমি হাসতে হাসতে বললুম।

হোম্‌স আমার কথার উত্তরে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে ঘরের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। (ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

দেখল কে আর

প্রণব মুখোপাধ্যায়

রেলগাড়িতে বাক্স-বেডিং তোলা,
ছুটলে তুমি মেঘ-পাহাড়ের ডাকে,
সোনার ধানে ভরল আমার গোলা,
আল্পনা তার ডেকে দেখাই কাকে ?

শোনাই কাকে দুপুর কেমন কাঁদে
ক্যাঁচকোঁচানি গোরুরগাড়ির চাকায়,
দেখল কে আর খয়রা দিঘির বাঁধে
বেলাশেষের রংটা বকের পাখায় ।

দেখলে না তো সকালবেলার হিমে
ভরল রসে খেজুরগাছের হাঁড়ি,
ঝাপটে ডানা নীলরঙা নিঃসীমে
দুরন্ত চিল জানায় খবরদারি ।

সূর্য দোরে রোদের সোনা বিকায়
কেঁদফুলে রং ধরল শয়ে শয়ে,
ছুটলে তখন পাহাড় আবাসিকায়
অনেক দূরে মহান হিমালয়ে !

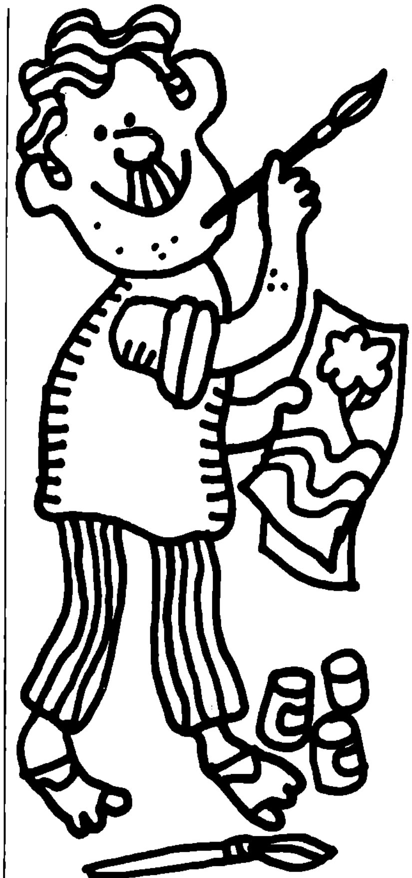

পাকুড়গাছির নাকুড়মামা

রবি ভট্টাচার্য

পাকুড়গাছির নাকুড়মামা
রাগলে পেটান ঢাক,
ডিগবাজি খান আনন্দেতে
ডাকেন হরেক ডাক ।
ছায়ার পিছে দৌড়ে বলেন,
"ধরব এবার ঠিক,
এইভাবে রোজ দৌড়ে আমি
জিতব অলিম্পিক ।"
দূরবিনে তাঁর দু' চোখ রেখে
খোঁজেন জলে মাছ
ইচ্ছে হলে আঁকেন ছবি
পুকুর, সাঁকো, গাছ ।
সাতরকমের হাসি হেসে
বোঝান তফাত মিল,
বুঝলে ভাল না বুঝলে ভাই
পড়বে পিঠে কিল ।

স্বপ্ন

সুখেন্দু মজুমদার

একটা ছেলে অঙ্ক কষে
একটা আঁকে ছবি,
একটা ছেলে পদ্য লেখে
চায় সে হতে কবি ।

একটা ছেলে ট্রেনে ট্রেনে
খেলনা করে ফেরি
দোকান করবে মস্ত বড়
হোক না যত দেরি ।

একটা ছেলে ঘরে ঘুমোয়
আরেকটা ফুটপাতে,
একটা ছেলে ভূতের ভয়ে
যায় না মোটে ছাতে ।

কারো বয়স দশ কি বারো
কারো বয়স ষোলো,
কেউ হতে চায় সোনার পেলে
কেউ বা মার্কোপোলো ।

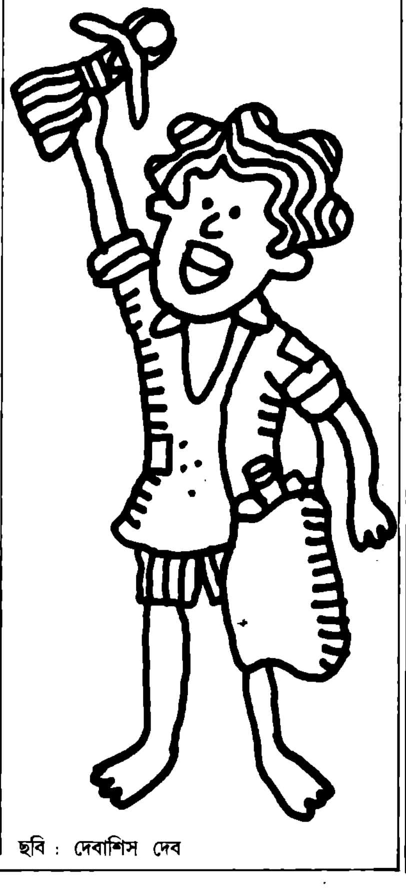

ছবি : দেবাশিস দেব

উপহারটা কী ? একটা কুমিরছানা !

নাম তার হারু

বিজনকুমার ঘোষ

শান্ত, কান্ত, ছোট বোন খুকু আর তাদের মা বারান্দায় চুপচাপ বসে ছিল। রাত এখন এগারোটা। বন-জঙ্গল, রেলের পুকুর, নারকেলগাছের সরু পাতায় পাতায় ঝিলিক-ফোটা জ্যোৎস্না। বাবা এখনও আসছেন না। মা ছাড়া আর সবার খাওয়া-দাওয়া সারা। এগারোটা মানে পাড়াগাঁর পক্ষে অনেক রাত। বাবা আগে ছিলেন ক্যানিং স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার। সেখানকার লোকরা বাবাকে খুব ভালবাসত। হঠাৎ বদলির খবর এলে বাবাকে নিয়ে সভা হয়। গাঁদাফুলের মালা, মিষ্টির প্যাকেট উপহার জোটে। একটি রোগা মেয়ে, কান্তর স্পষ্ট মনে আছে, সভার শুরুতে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গেয়েছিল : হে বিজয়ী বীর নবজীবনের প্রাতে—

শান্ত একটু উঁচু ক্লাসে পড়ে। এ-গান যে বাবার উদ্দেশে—সেটা বুঝতে একটুও কষ্ট হয়নি। তবে বাবার যা বয়েস তাতে 'নবজীবনের প্রাতে' বলাটা বেমানান। কিন্তু তাই বলে রবীন্দ্রনাথের ওপর তো কলম চালানো যায় না। অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল ক্যানিংয়ে। আর স্টেশন-মাস্টারের ছেলেমেয়ে বলে খুব খাতির ছিল ওদের। সেই নদীর পারের সুন্দর জায়গা ছেড়ে আসতে হল কিনা লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে। সবারই মনখারাপ। তবু বাবা মাঝে-মাঝে যান অফিসের কাজে। সেখানে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয়। আর শান্ত, কান্ত, খুকু—তিনজনে মিলে লুডো খেলে। কথা বলারও কেউ নেই। কখনও রেকর্ড-প্লেয়ারে গান শোনে।

আরও অনেকক্ষণ পর বাবা এলেন। রিকশায় মুখ-বাঁধা একটা মস্ত বড় মাটির হাঁড়ি। ওরা ভেবেছিল নলেনগুড়, কি জয়নগরের মোয়া। তার বদলে, বাবা একটু নাটক করে, দু'-হাত দিয়ে বের করলেন কিলবিল করা একটা জীব, সাইজে টিকটিকির চেয়ে দশ-বারো গুণ বড়। সবাই চেঁচিয়ে উঠল, "ওমা ! এটা কী ? এটা কী ?"

বাবা বললেন, "কুমিরছানা। সদ্য ডিম ফুটে বেরুনো

মাতলার জেলেদের জালে উঠেছিল। আমাকে প্রেজেন্ট করেছে।"

"সে আবার কী," মা দু-পা পিছিয়ে গেলেন। "কুমির উপহার তো কখনও শুনিনি। এক্ষুনি ফেলে দিয়ে এসো বলছি। ছেলেপুলেরা ভয় পাবে।"

"অসম্ভব," বাবার এক কথা, "আলবত পোষ মানবে। পৃথিবীতে আমি নতুন নজির গড়তে চাই। তা তোরা কী বলিস ?"

শান্ত, কান্ত, খুকু মাকে একা ফেলে তক্ষুনি বাবার দলে ভিড়ে গেল। অর্থাৎ ভোটাভুটিতে জিত। ফলে সে-রাতেই কুমিরছানা পরিবারের একজন বিশিষ্ট সদস্য হয়ে গেল। একবাটি দুধ চুক-চুক শব্দে ফিনিশ। এখন শোবার ব্যবস্থা। তাও হয়ে গেল কেরোসিন কাঠের বাক্সে বস্তা পেতে। এর কিছুক্ষণ পরে পরিবারের আর এক বিশিষ্ট সদস্য হুলোকে বাড়িছাড়া হতে হল। কেননা, ওদের বিশ্বাস নেই।

রাত্রে দারুণ উত্তেজনা। কারও চোখে ঘুম নেই। কেবল মা একা গজগজ করে যেতে লাগলেন রাগে। কিন্তু ভোটে-হেরে-যাওয়া লোকের কথার কী দাম! খুকু বলল, "বাবা মশারি টাঙালে না, মশা কামড়ায় যদি ?"

সবাই হো-হো করে হেসে উঠল এ-কথায়। ক্যানিংয়ে থাকতে শান্ত তিন-তিনটে লাইব্রেরির বই একা শেষ করেছে। দারুণ জ্ঞানগম্যি। বলল, "কুমির আর গণ্ডারের চামড়া দারুণ মোটা হয় রে! মশাদের ইঞ্জেকশন ভেঙে যাবে।"

কান্ত একটা সমস্যা তুলে ধরল, "বাবা, জল না হলে তো কুমির বাঁচবে না। মাতলা এখান থেকে অনেক দূরে।"

বাবা বললেন, "নদী না থাক, পুকুর তো আছে। অত বড় রেলের পুকুর, হারাধন মনের সুখে সাঁতার কাটবে।"

"বাবা, হারাধন কে ?"

"কুমিরটার নাম রেখেছি হারাধন।"

"বাহ্! চমৎকার! সংক্ষেপে হারু।" তিনজনেই চিৎকার করে উঠল।

শান্ত সঙ্গে সঙ্গে ছড়া বানিয়ে ফেলে—

কুমিরের নাম হারু
ক্ষতি করে না কারু,
পেটমোটা মাথা সরু
লেজের দিকটা ঝাড়ু।

দাদার সঙ্গে কোনও ব্যাপারে পেরে ওঠে না কান্ত। তাই বলে দাদা যে সহজে পার পেয়ে যাবে, তাও নয়। পয়েন্ট অব অর্ডার তুলল, "ঝাড়ু আবার কী ?"

"বোকা, ঝাড়ু মানে ঝাঁটা। লেজের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে রে।"

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে ধমক ছুটে এল, "রাত-দুপুরে ছড়া কাটা হচ্ছে! কাল সকালেই কুমির-ফুমির বিদেয় করে দেব। যত সব আপদ।"

এরপর আর কিছুই করার থাকে না এক নাসিকাগর্জন ছাড়া।

পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেল সবার। পাউরুটির মাঝখানের অংশ আর হরলিকস দিয়ে হল হারুর ব্রেকফাস্ট। দেখা গেল খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে হারুর বহুমুখী প্রতিভা! কান্ত একটা আরশোলা ফেলে দিতে চোখের পলকে দাঁতের ফাঁকে চালান হয়ে গেল। পারশে মাছ, আলু, টমেটো—না, অরুচি বলতে নেই। বাজারের থলিটা এক্সপেরিমেন্টের গুঁতোয় ফাঁকা হয়ে যেত যদি না মা রুটি-বেলা বেলুন নিয়ে সামনে দাঁড়াতেন।

টানাটানির চোটে হাত-পা একটু ছড়েও গেল। বাবা সবাইকে লাল ওষুধ লাগিয়ে দিলেন আর হারুর নখে, লেজে ডেটল। একটু হলে ডেটলের শিশিটা খেয়ে ফেলত। মনে হচ্ছে, একটু যেন পোষও মেনে গেছে। আগের মতো হাঁ করে দাঁত দেখাচ্ছে না। জাতে কুমির হলেও হারু যত্নআত্তির মর্মটা ভালই বোঝে।

বাবা এরপর নাইলনের সরু দড়ি কোমরে বেঁধে হারুকে রেলের পুকুরে ঝপাং করে ফেলে দিলেন। এই ব্যবস্থায় মা সবচেয়ে খুশি। যার যেখানে স্থান। হরলিকসের শিশিটা ইতিমধ্যেই অর্ধেক হয়ে গেছে।

এর কিছুক্ষণ পরেই সারা গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে গেল বিকাশবাবু সুন্দরবনের বিরাট এক কুমির রেলের পুকুরে ছেড়ে দিয়েছেন মাছ চুরি আটকাতে। পলান ঘোষ নাকি নিজের চোখে সেই কুমিরটাকে কুকুর মুখে নিয়ে তলিয়ে যেতে দেখেছে। একটা উপকার হল, মাছ চুরি বন্ধ হয়ে গেল। রাত্রে ঝুপঝাপ খেপলা জালের শব্দ আর শোনা যায় না। সকাল-দুপুর পুকুরের পুব দিকে ছিপ হাতে বসে যায় একদল বেকার লোক। পুব দিকটা এখন সুনসান। ফাঁকা। নোংরা কাপড় কাচতে আসত গ্রামের মেয়েরা। মাঠে লাঙল চষার পর মোষগুলি সেই যে জলে নামত আর উঠতে চাইত না। কেউ-কেউ আবার পাট পচানো শুরু করেছিল। রেলের পুকুর মানেই যেন যা খুশি তাই করা যায়। এইসব আপদ বিদায় হল অতি সহজেই। এ-জন্যেও হারুকে দাঁত দেখাতে কিংবা লেজ আছড়াতেও হল না। কুমির নামের এমনই মহিমা!

এদিকে পুকুরটাকে হারুর খুব ভাল লেগে গেছে। আজকাল আর বাড়িতে আসতেই চায় না। মাঝে-মাঝে নাইলনের দড়ি টেনে টেনে শান্ত, কান্ত হারুকে ওপরে তোলে। গায়ে-মাথায় হাত বোলায়। বাড়ির খাবার খেতে দেয়। এর কিছুদিন পর হারু বলে ডাক দিলেই চলে আসে। এখন আর দড়ি বাঁধতে হয় না। পুকুরের মাছ খেয়ে খেয়ে স্বাস্থ্যও ভাল হয়েছে। দিব্যি নধরকান্তি। একা-একা লাইন পেরিয়ে বাড়িতেও চলে আসে। উঠোনের চাতালে বসে রোদ পোহায়। এই ব্যাপারটাকে মা একদম সহ্য করতে পারেন না। লম্বা মুখ দিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে দেখতেই গজগজ শুরু হয়ে যায়। দেশে নাকি কুমির-বংশ লোপ পাচ্ছে। এ যে দেখছি শশিকলার মতো বাড়ছে। যমেরও অরুচি! লোকে শখ করে টিয়া পোষে, ময়না পোষে। উনি কুমির পুষে পৃথিবীতে নাম করবেন। শখ বটে! ইত্যাদি ইত্যাদি।

শান্ত সাবধান করে দেয়, "মা, হারু কিন্তু কথা বোঝে। দেবে একদিন লেজের ঝাপটা।"

মা চুপ করে যান।

দিনকয়েক পর সেই মা হঠাৎ হারুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ও একটা জব্বর কাজ করেছে। আড়াই কেজি ওজনের লাল রঙের একটা কাতলা মাছ মুখে করে বাড়িতে এসে হাজির। সেই মাছের ভাজা হল, ঝোল হল, ঝাল হল। দুপুরে খেতে

বসে বাবা তো অবাক ! "বাহ্ ! হারুকে ট্রেনিং দিলে অনেক কাজ হবে দেখছি ! রেলের পুকুরের মাছ বারো ভূতে লুটেপুটে খেত । যাক, হারুর কল্যাণে আমরাও খেলাম ।"

ওর এখন অনেক সাহস বেড়েছে। বাবার সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনেও চলে যায়। প্ল্যাটফর্মে অকেজো একটা ওজন-যন্ত্র পড়ে আছে বহুকাল ধরে। হারু তার ওপরে উঠে চুপচাপ বসে থাকে।

বিকাশবাবু খুব কড়া স্টেশন-মাস্টার। টিকিট না কেটে ট্রেনে চড়া একদম সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু একা মানুষ ক' দিক সামলাবেন ! এখানে কয়েকজনেরই মাত্র মান্থলি আছে। প্ল্যাটফর্মের পুব দিকে লোহার রেলিংয়ের একটা শিক উধাও। বিনা টিকিটের যাত্রীরা সাধারণত এই পথে যাতায়াত করতে ভালবাসে। তা সেদিন গ্রামের পুরুতমশাই এগারোটা পঁয়তাল্লিশের লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল থেকে নেমে ধীরেসুস্থে শরীরটাকে যেই লোহার রেলিংয়ে গলিয়ে দিয়েছেন, হঠাৎ তখন কী মনে করে, হারু দৌড়ে এসে কাপড়ের খুঁটটাকে কামড়ে ধরল। ভয়ে চিৎকার করে হাত থেকে চালকলার পোঁটলা ফেলে পুরুতমশাই তো অজ্ঞান হওয়ার দাখিল। বিকাশবাবু সেই সময় না এসে পড়লে ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে যেত। হারুর মনে কী ছিল কে জানে ! বিকাশবাবু হেসে বললেন, "আর কেন, বয়েস তো অনেক হল পুরুতমশাই। এবার টিকিট কেটে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করুন। দেখবেন হারু কিচ্ছু বলবে না।"

ব্যস, চারপাশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। নানারকম রঙ চড়ল তাতে। পাড়ার চায়ের দোকানে সবাই বলাবলি করতে লাগল, রেলমন্ত্রী মিশরের নীল নদ থেকে একটা বাচ্চা কুমির কিনে পরীক্ষা করে দেখতে এই স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এরা হল কুমির-সমাজে কুলীন। টিকিট কাটো, কিচ্ছু বলবে না। কিন্তু না কাটলে রক্ষে নেই, খাবলা-খাবলা মাংস তুলে নেবে। কয়েকজন তো নিজের চোখেই এসব কাণ্ড-কারখানা দেখেছে। যে-সে কুমির নয়, রীতিমত ট্রেনিং-পাওয়া কুমির—হেঁ—হেঁ—

চায়ের দোকানের ছোকরা মালিক গোবিন্দ এই সময় গলাখাঁকারি দেয়। তার মানে কোনও নতুন কথা বলবে। সবাই মুখের দিকে তাকিয়ে। গোবিন্দর পিসতুতো ভাই কলকাতার রেলের বড় অফিসে যাতায়াত করে। সুতরাং হক কথা বলার অধিকার একমাত্র তারই আছে। চায়ের গেলাসে ঠুং-ঠুং করে চিনি মেশাতে মেশাতে বলল, "বিকাশবাবুর শিগগির প্রোমোশন হবে। কুমির আনার পরামর্শ বিকাশবাবুই তো রেলমন্ত্রীকে দিয়েছেন। এবার থেকে যেখানে-যেখানে টিকিট কাটার বালাই নেই, সেখানে-সেখানে নীল নদের কুমির ঘুরিয়ে আনা হবে। সঙ্গে থাকবে বিকাশবাবু হান্টার নিয়ে। ওসব ফাইন-টাইনে কিচ্ছু হয় না— ।"

চায়ের দোকানের পনেরো-ষোলোজন খদ্দেরের মুখ এক সঙ্গে শুকিয়ে গেল। অর্থাৎ সুখের দিন খতম।

সকাল-সন্ধে এখন টিকিট কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইন। এক-এক সময় বিকাশবাবু হিমসিম খেয়ে যান। আর একটা উপকার হল হারুর কৃপায়। স্টেশনে বাজে লোকের আড্ডা, কি ভবঘুরেদের আস্তানা একেবারে ঘুচে গেল। পাড়ার কুকুরগুলো প্ল্যাটফর্মে এসে অকারণে ঝগড়া করত। হারুর

ভয়ে তারা আর আসে না। স্টেশনে এখন পাতা পড়ার শব্দ শোনা যায়।

প্রোমোশন হয়নি ঠিকই, কিন্তু রেলের হেড অফিস থেকে বিকাশবাবুর নামে দু-খানা সার্টিফিকেট এল কয়েক মাসের মধ্যে। সবচেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্টেশন এবং আয়বৃদ্ধি—যা কখনও চিন্তাই করা যায়নি। বিকাশবাবুর আনন্দ দেখে কে !

শান্ত, কান্ত, খুকু এখন হারুর পিঠে চড়ে সত্যিকারের কুমির-কুমির খেলে। মা কিন্তু সেই কথাটা ভোলেন না, "হ্যাঁগো, তোমার প্রোমোশনের কী হল ?"

শান্ত একটা ছড়াও লিখে ফেলেছে—

লোকে কাটে টিকেট
বাবা পান সার্টিফিকেট—
মা'র জন্যে কাত্‌লা
হারু ভোলে মাত্‌লা।

ছবি : অনুপ রায়

ধাঁধা

অনেকেরই এমন অভ্যেস থাকে, সেজোদাদুরও রয়েছে। একটু বাড়িয়ে বলার অভ্যেস। আর এই অভ্যেস নিয়ে ছোট্‌কা সুযোগ পেলেই ঠাট্টা-তামাশা জুড়ে দেয়। যেমন ধরো, একটা ছেলে হয়তো বেশি দুষ্টুমি করল। সেজোদাদু সে-কথাটা বলতে গিয়ে বলবে, ছেলেটার তেরোটা বেজে গেছে। আসলে অন্যরা বলত, বারোটা বেজে গেছে। সেজোদাদু তাতে খুশি নন, তিনি বলবেন, তেরোটা বাজার কথা। ছোট্‌কারও দুষ্টুমি-বুদ্ধি কম নয়, ছোট্‌কা সেজোদাদুর সামনেই বলে উঠল একদিন, 'ছোটবেলায় আমরা ছিলাম যাকে বলে গিয়ে দশটি বয়'। সবাই যখন অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ছোট্‌কাকে 'দশটি বয়' মানে ? ছোট্‌কা গম্ভীরভাবে বলল, 'নটি বয়' তো সবাই থাকে, আমরা ছিলাম আরো এক ডিগ্রি ওপরে, তাই বললাম 'দশটি বয়'। সেই শুনে সেজোদাদু ছাড়া সবাই হেসে উঠল।

কিন্তু সেদিন ছোট্‌কা বলল, "সেজোদাদুর এই 'তেরোটা বাজা' নিয়ে আর ঠাট্টা করা চলবে না সতুবাবু। বিদেশে এখন এমন ঘড়ি তৈরি হচ্ছে যাতে সত্যি-সত্যি তেরোটা বাজা দেখানো হয়।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম। ছোট্‌কা তখন বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা। আর সেই সঙ্গে দিল মজার একটা ধাঁধা। সেটাই দিচ্ছি এবার।

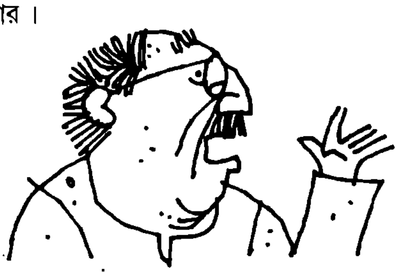

প্রথম ধাঁধা ॥ একটা ঘণ্টাপেটা ঘড়ি। ঘড়িটাতে ২৪ ঘণ্টাই দেখানো রয়েছে। প্রতি ঘণ্টায় ঘড়িটাতে ঢং কিংবা ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজে। অর্থাৎ, একটা বাজলে একবার ঘণ্টা বাজবে, কুড়িটার ঘরে কাঁটা গেলে কুড়িবার শোনা যাবে ঘণ্টার আওয়াজ।

তা, এমন একটা ঘড়িতে ২৪ ঘণ্টায় বেজে-যাওয়া ঘণ্টার আওয়াজের মোট সংখ্যা কত ? অর্থাৎ, দিনে-রাতে মিলিয়ে কতগুলো আওয়াজ শোনা যাবে ঘড়িটায় ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ পরবর্তী সংখ্যাটি কত ?

১, ৩, ৯, ২৭, ৮১, ২৪৩,?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ বেমানান কে ?

মার্জার, করী, কপিঞ্জল, কপি, তুরঙ্গ

গতবারের উত্তর ॥ (১) দুবার ওজন করলেই হবে। প্রথমে পাল্লার দুদিকে তিনটে-তিনটে করো। যদি সমান হয়, অবশিষ্টটা হাল্কা। যদি অসমান হয়, তাহলে হাল্কা দিকের তিনটে নিয়ে তার থেকে দুটো দুদিকের পাল্লায় বসিয়ে দ্বিতীয়বার ওজন করা। এবারেও যদি সমান হয় তাহলে অবশিষ্টটি, না হলে দুইয়ের মধ্যে হাল্কাটি। (২) ১০। (৩) সমীকরণ।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১				২		৩
			৪			
৫	৬				৭	
	৮					
৯					১০	১১
১২					১৩	
		১৪				

সংকেত : পাশাপাশি : (১) চিতাবাঘ। (২) ইসলামধর্মের ইষ্টমন্ত্র। (৫) তেতো ফল বা গাছ, শব্দের আগে উপসর্গরূপেও বসতে পারে। (৭) শুকনো মাটির কণা। (৮) জমজমাট। (৯) কী টানলে মাথা আসে ? (১০) ময়ূরের ডাক। (১২) দেনদার দেয়, পাওনাদার নেয়। (১৩) ছবি আঁকতে লাগে। (১৪) বন্দুক-বিশেষ।

উপর-নীচ : (১) হাতে এলে মাথায় উঠতে চায়। (৩) ইন্দ্রের সারথি। (৪) জাতীয় সংগীত। (৬) রাজার আসন। (৭) সৌর আকাশে ঘুরে-ঘুরে আসে। (৯) আমের সঙ্গে সরষে মিলিয়ে যে আচার। (১১) যমুনা-নদী।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ফ	লা	র		কা	য়	রো
স		সি		ছি		জ
ফ	ল	ক		ম	য়	না
রা			কা			ম
স	ই		ল		পেঁ	চা
		সি	নে	মা		
	তা	ল	মি	ছ	রি	

মজার খেলা

বারোটা সিকি যোগাড় করতে হবে এবারের মজার খেলার জন্য। না হলে, সিকির মাপে ছোট-ছোট, গোল-গোল, টিপের মতো কাগজ কেটে নাও। উপকরণ প্রস্তুত ? বেশ, তাহলে ওগুলোকে নীচের ছবির মতো টেবিলের উপর সাজিয়ে ফেলো—

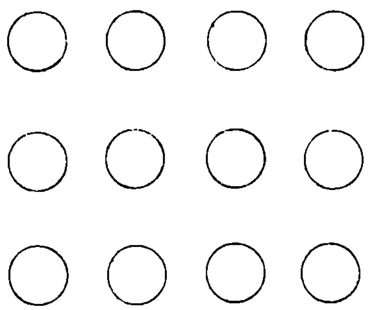

এবার কোনও বন্ধুকে ডাকো। তাকে বলো, এই বারোটা সিকিকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে কিনা তিনটে সরলরেখায় সিকিগুলো থাকবে, আর প্রত্যেক সরলরেখায় থাকবে বিজোড়-সংখ্যক সিকি।

দেখা যাক, বন্ধুর বুদ্ধির দৌড় কত।

বন্ধুর দৌড় বন্ধু দেখাক, তার আগে তোমার নিজের বুদ্ধি কী বলে, সেটাও চুপি-চুপি বলে ফেলো। কী বললে ? অসম্ভব ব্যাপার।

যদি চেষ্টা না করেই অসম্ভব ব্যাপার বলো, তাহলে আমি উত্তর করে দেখাব না। কিন্তু চেষ্টা করেও যারা ব্যর্থ, তাদের জন্য সমাধান নীচে দেখানো হল—

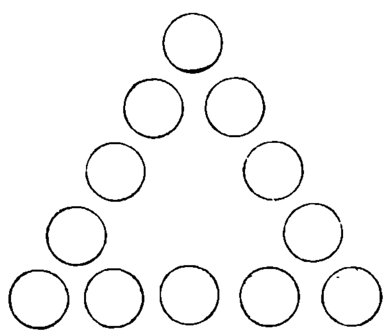

প্রতি লাইনে ৫টি করে হচ্ছে। হচ্ছে না ?

মজারু

হাসিখুশি

কারাধ্যক্ষ কয়েদিকে ডেকে বললেন, "দেখুন, আপনার কারাবাসের মেয়াদ দশদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের হিসেবের ভুলে অকারণ আপনাকে বেশি সময় এখানে কাটাতে হল।"

কয়েদি হেসে জবাব দিল, "এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। ওই দশদিন আমার নামে জমা করে রাখুন। পরের বারে এলে বাদ দিয়ে দেবেন।"

"যে ফি-বছর ফেল করে, তার জন্য আমার কোনও সহানুভূতি নেই।"

"যে প্রতি বছর ফেল করে, সে কোনও সহানুভূতি আশাও করে না।"

বিচারক : তুমি দোষী না নির্দোষ ?

আসামি : এতদিন তো জানতাম আমি দোষীই, কিন্তু উকিলের সঙ্গে কথা বলে মনে হল নির্দোষ।

মৃত্যুশয্যায় এক ব্যবসায়ী তাঁর উকিলকে ডেকে বললেন, "দেখুন, আমার কোম্পানিতে যাঁরা কুড়ি বছরের বেশি সময় ধরে যুক্ত, তাঁরা এখন থেকে প্রতি বছর দু'হাজার টাকা করে বোনাস পাবেন।"

"কিন্তু আপনার ব্যবসা তো মাত্র দশ বছরের।"

"আমি জানি। কিন্তু এতে আমার কোম্পানির বিজ্ঞাপনটা কেমন হল বলুন ?"

"আমার জ্যাঠামশাই আর আমি পৃথিবীর সব কিছু জানি।"

"তাই নাকি ? বলো তো, 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' কোথায় আছে ?"

"আমি না পারলে কী হবে। জ্যাঠামশাই ঠিক জানেন।"

"আপনার স্প্যানিয়েলটা আমার হাঁটুতে কামড়েছে।"

"অত ছোট কুকুর, আপনার গলায় কামড়াবে কী করে বলুন ?"

প্রথম উকিল : আপনি একটি নির্বোধ।

দ্বিতীয় উকিল : আপনি একটি মিথ্যেবাদী।

বিচারক : অনুমতি দিলাম, যতক্ষণ না আপনাদের সঠিক চরিত্র বুঝতে পারা যায়, ততক্ষণ ঝগড়া চালিয়ে যান।

ছবি : দেবাশিস দেব

তরতাজা স্বাদ, চনমনে গন্ধ...
আর ফলে ফলে ঠাসা...
'কাঞ্চন'
Kanchan
MANGO JUICE
Kanchan
ORANGE JUICE
Kanchan
Kanchan
দার্জিলিং আর পাহাড়তলির বাছাই
করা ফল থেকে—জিভে জল আসা
জ্যাম, জেলী, মার্মালেড, স্কোয়াশ,
সস্, টিনেভর্ত্তি জুস্, আনারসের
মিষ্টি চাকা আর টিট্‌বিট্‌স্।
Kanchan
Darjeeling Fruit & Vegetable
Processing Co-operative Society Ltd.
Mileage/K-2

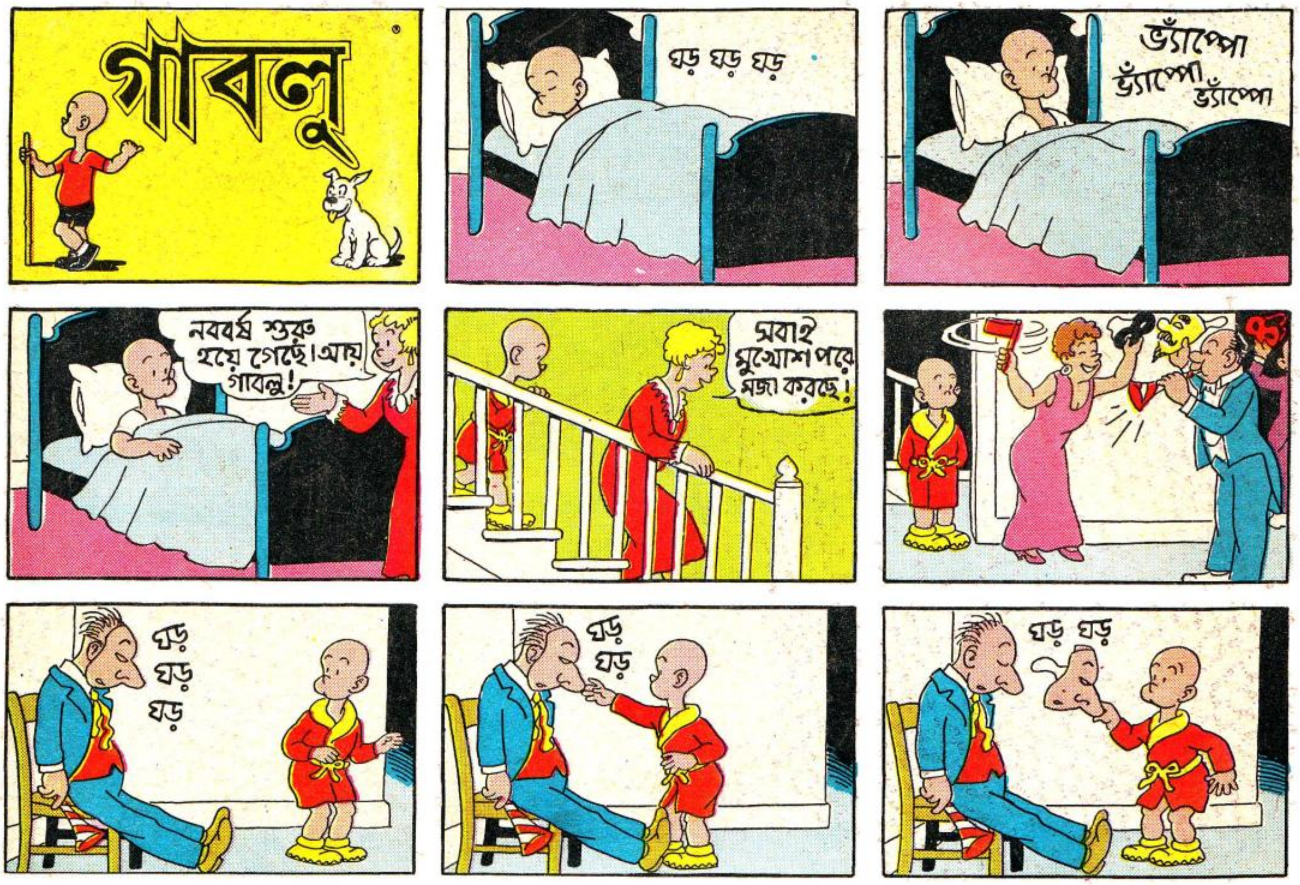
গাবলু
ঘড় ঘড় ঘড়
ভ্যাঁপ্পো ভ্যাঁপ্পো ভ্যাঁপ্পো
নববর্ষ শুরু হয়ে গেছে। আয় গাবলু!
সবাই মুখোশ পরে মজা করছে!
ঘড় ঘড় ঘড়
ঘড় ঘড়
ঘড় ঘড়

গাবলু
গাবলু খুব ভাল ছেলে
কতবার বলেছি যেখানে-সেখানে লিখবে না?
দেড়শো বার

নিউজিল্যাণ্ডের নাটকীয় জয়

অশোক রায়

এ যেন বেশ মজার নাটক। প্রথম দৃশ্য অভিনীত হয়েছিল পাকিস্তানের হোম-গ্রাউণ্ডে। বীরদর্পে দুই পাক-স্পিনার আবদুল কাদির আর ইকবাল কাশিম নিউজিল্যাণ্ড ব্যাটসম্যানদের কচুকাটা করেছিলেন স্পিনের ধারালো অস্ত্রে। পাকিস্তান সিরিজ জিতেছিল ২-০ মার্জিনে।

পরের দৃশ্য অভিনীত হল সম্প্রতি নিউজিল্যাণ্ডের মাটিতে। দেশের মাঠে দলে ফিরলেন রিচার্ড হ্যাড্‌লি এবং অধিনায়কত্বও ফিরে এল জিওফ হাওয়ার্থের হাতে। এই দুটি পরিবর্তনের আমূল প্রভাবে নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেটাররা পাকিস্তানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তিটুকু ফিরে পেলেন। পাকিস্তানের মাটিতে নিউজিল্যাণ্ড হেরেছিল ০-২ মার্জিনে। এবার চাকা ঘুরে গেল। পাকিস্তানকে কোণঠাসা করে ২-০ ফলাফলে সিরিজ জিতল নিউজিল্যাণ্ড।

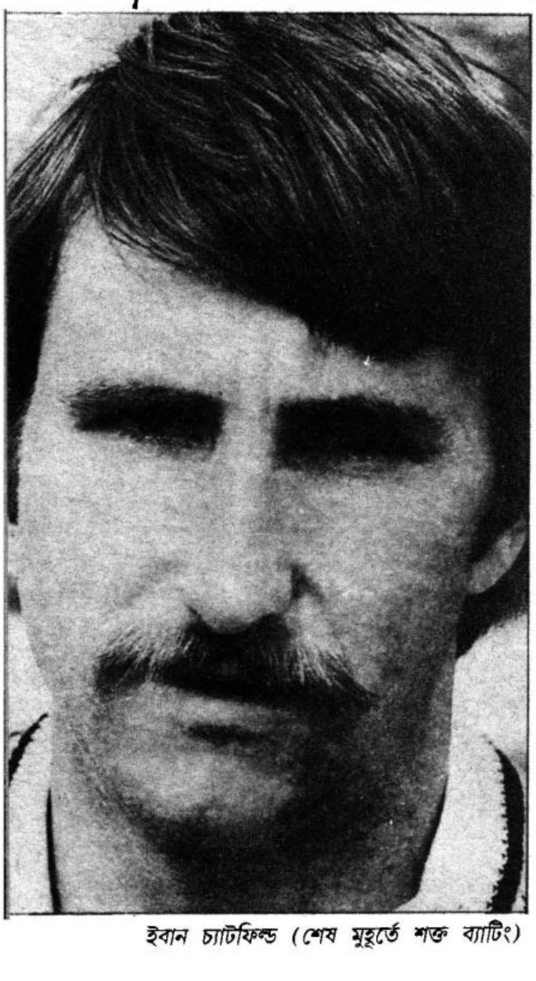

ইবান চ্যাটফিল্ড (শেষ মুহূর্তে শক্ত ব্যাটিং)

চলতি সিরিজের তৃতীয় বা শেষ টেস্টেই উত্তেজনা ওঠে তুঙ্গে। ডুনেডিনে যখন শেষ টেস্ট শুরু হয় তখন পাকিস্তান ওয়ান-নিলে পিছিয়ে। সুতরাং শেষ ম্যাচে তারা যে মরণ-কামড় দেবে এটা জানাই ছিল। একটা সময় পর্যন্ত মনে হয়েছিল পাক ব্যাটসম্যানরা শুরু করেছে ভালই। দু-উইকেটে ২৪১ যে-কোনও দলের পক্ষেই শুভ সূচনা। কিন্তু পরবর্তী পর্বে পিচের খামখেয়ালি আচরণে পাক ইনিংসে ধস নামে। উইকেটের অসমান বাউন্স কাজে লাগিয়ে রিচার্ড হ্যাডলি রুদ্রমূর্তি ধরেন। একটা ভয়ংকর স্পেলে হ্যাডলি মাত্র পাঁচ রানে ফেরত পাঠান চার পাকিস্তানিকে। ২৭৪ রানে পাক ইনিংস খতম করতে হ্যাডলি মাত্র ৫১ রানে ৬ উইকেট সংগ্রহ করেন। সেইসঙ্গে পূর্ণ করেন টেস্ট ক্রিকেটে নিজস্ব আড়াইশো উইকেটও।

আকস্মিক আঘাতে পাকিস্তান যে ভেঙে পড়েনি সেটা বোঝাবার দায়িত্ব নেন আঠারো বছরের তরুণ, জীবনের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে-আসা ওয়াসিম আক্রম। আক্রমের আক্রমণে (৫৬ রানে পাঁচ উইকেট) নিউজিল্যাণ্ড ইনিংস শেষ করে মাত্র ২২০ রানে। ৫৪ রানে এগিয়ে থাকার অভাবিত সুযোগ হাতে পেয়েও পাকিস্তান কিন্তু বড় রানের ইনিংস গড়তে পারল না। কাশিম ওমর, যিনি প্রথম ইনিংসে ৯৬ রান করেছিলেন, তিনি দ্বিতীয় দফাতেও করলেন ৮৯। দুর্ভাগ্য, তাঁকে দু-ইনিংসেই সেঞ্চুরির দরজা থেকে

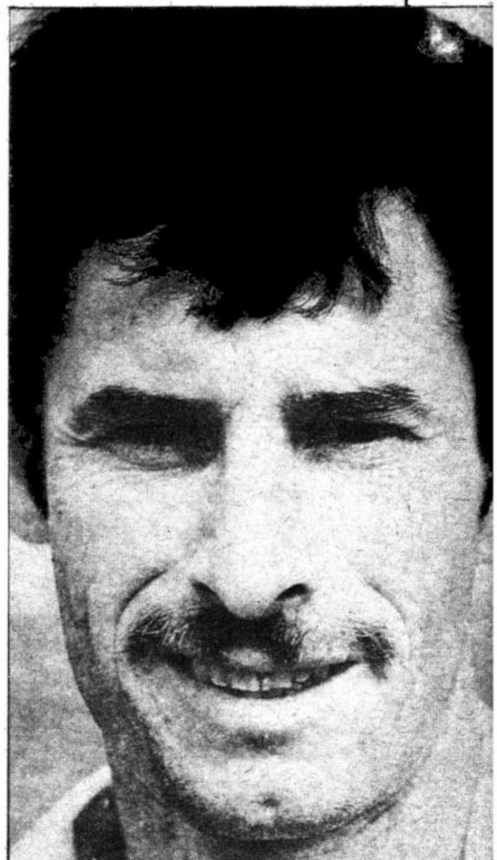

রিচার্ড হ্যাডলি (৫ রানে ৪ উইকেট)

ফিরে আসতে হয় মাত্র চার এবং এগারো রানের জন্যে। পাকিস্তান শেষ হয় ২২৩ রানে। বলাবাহুল্য, লো-স্কোরিং ম্যাচে ২৭৮ রান তুলে জেতার কঠিন চ্যালেঞ্জটি ঝুলছিল নিউজিল্যাণ্ড ব্যাটসম্যানদের সামনে। কিন্তু বোর্ডে মাত্র তেইশ রান উঠতে না উঠতেই চার-চারজন ব্যাটসম্যান প্যাভেলিয়ানে ফেরত যাওয়ায় রঙিন ব্যাপার সঙ্গিন হয়ে ওঠে। ঘোরালো অবস্থা সামাল দিতে মার্টিন ক্রো (৮৪) এবং জেরেমি কোনির ব্যাট (অপরাজিত ১১১) অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। মজার কথা, এই কোনিই ছিলেন গত পাকিস্তান সফরে পরাজিত নিউজিল্যাণ্ড অধিনায়ক। দশ নম্বরে ব্যাট করতে এসে চ্যাটফিল্ডও সংগ্রহ করেন অমূল্য একুশটি রান। নিউজিল্যাণ্ড আট উইকেট হারিয়েই পেয়ে যায় জয়ের নাগাল, সেইসঙ্গে সিরিজ জেতার আনন্দও।

জাতীয় হকিতে সার্ভিসেস চ্যাম্পিয়ান

নৃপতি চৌধুরী

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় অর্থাৎ রঙ্গস্বামী কাপে বিজয়ী হল সার্ভিসেস। ১৯৭৬ সালের পরে এই প্রথম ফাইনালে উঠে গত পাঁচ বছরের ফাইনালিস্ট এবং মোট পনেরোবারের চ্যাম্পিয়ান পঞ্জাবকে পরাজিত করে জাতীয় হকিতে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করল (এককভাবে পঞ্চমবার)।

ঘরোয়া হকিতে পঞ্জাব বরাবরই শক্তিশালী দল। বাইশবার ফাইনালে উঠে তারা ট্রফি জিতেছে কমপক্ষে সতেরোবার, যার মধ্যে যুগ্ম বিজয়ীর স্বীকৃতি আছে বারদুয়েক। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত উপর্যুপরি তিনবার চ্যাম্পিয়ান হবার পরে গত বছর ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কাছে ফাইনালে হেরেছে পঞ্জাব। বলা বাহুল্য রেকর্ডেই ধরা রয়েছে, পঞ্জাবের ধারাবাহিক সাফল্যের কথা। পক্ষান্তরে, সার্ভিসেস বারোবার ফাইনালে পৌঁছেও সাতবারের বেশি ট্রফি জিততে পারেনি। অবশ্য এর মধ্যে আছে বারদুয়েক যুগ্ম জয়ের সম্মান।

এবারের আসরে সার্ভিসেসই ছিল একমাত্র দল যে-দলটি একটি ম্যাচেও পরাজিত হয়নি। অন্যদিকে পঞ্জাব অবশ্য গ্রুপ লিগে হেরেছিল বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে। সেমি ফাইনালে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সকে পরাজিত করে সার্ভিসেস পৌঁছয় ফাইনালে। ওদিক থেকে পঞ্জাব ফাইনালে যায় শক্তিশালী রেলওয়েজকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে হারিয়ে। সুযোগ নষ্টের কারণেই অসাধারণ খেলা খেলেও রেলওয়েজ জয় পায়নি।

ফাইনালে পঞ্জাবের প্লেয়ারদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে লড়াই হল সার্ভিসেসের তারুণ্যের। ৪৯তম জাতীয় হকির ফাইনালে ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি চান্স সামনে রেখে মুখোমুখি হয় পঞ্জাব ও সার্ভিসেস। পঞ্জাবের ডিপ ডিফেন্স যতটা শক্তিশালী, সার্ভিসেসের ফরোয়ার্ড লাইন ছিল ঠিক ততটাই কুশলী। তবে সার্ভিসেসের গোলরক্ষক রোমিও জেমসের তৎপরতা এবং নির্ভরযোগ্যতা ছিল তাদের বাড়তি সম্পদ।

সত্তর মিনিটব্যাপী লড়াইতে দু-দলই মন-মাতানো হকি উপহার দিয়েছে। অতিরিক্ত তিরিশ মিনিটে উভয় দল একটি করে গোল করায় ফলাফল আটকে থাকে এক বিন্দুতে। ফলে খেলার নিষ্পত্তির জন্যে শরণাপন্ন হতে হয় টাই-ব্রেকারের। দলের সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্তে গোলরক্ষক রোমিও জেমসের কৃতিত্বে রক্ষা পায় সার্ভিসেস। দুটি পেনাল্টি স্ট্রোক দর্শনীয়ভাবে আটকে দিয়ে পঞ্জাবকে রুখে দেন জেমস। শেষপর্যন্ত ১০-৯ গোলে হারিয়ে রঙ্গস্বামী কাপ ঘরে তোলে সার্ভিসেস। জাতীয় হকির ফাইনালে এই দুই দলের এটি ছিল চতুর্থ সাক্ষাৎকার। এবারের জয় সার্ভিসেসকে সম্মানজনক ২—২ ফলাফলে পৌঁছে দেয়। পঞ্জাবের পক্ষে পেনাল্টি কর্নার বিশেষজ্ঞ দেবিন্দর সিং সাতটি গোল করে টুর্নামেন্টে সেরা গোলদাতার সম্মান পান।

জাতীয় হকি শেষ হল। কিন্তু দুর্বল আম্পেয়ারিং, খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলাহীনতা এবং হকির নিম্নমান এবারের আসরকে ম্রিয়মাণ করে রেখেছিল। সত্যি কথা বলতে কী, লড়াই মূলত সীমাবদ্ধ ছিল রেলওয়েজ, সার্ভিসেস, পঞ্জাব এবং এয়ারলাইন্সের মধ্যে। বাকি আটটি দলের মধ্যে বোম্বাই ও বিহার কিছুটা লড়াই করলেও, অন্যদের খেলায় 'দৃঢ়তা' শব্দটি ছিল অনুপস্থিত। মাঠে নামী-নামী খেলোয়াড়দের অশোভন আচরণও ঠেকেছে দৃষ্টিকটু।

ভারতীয় হকির মান উন্নয়নের কথা যাঁরা ভাবেন, বলা বাহুল্য এবারের আসর তাঁদের হতাশ করেছে।

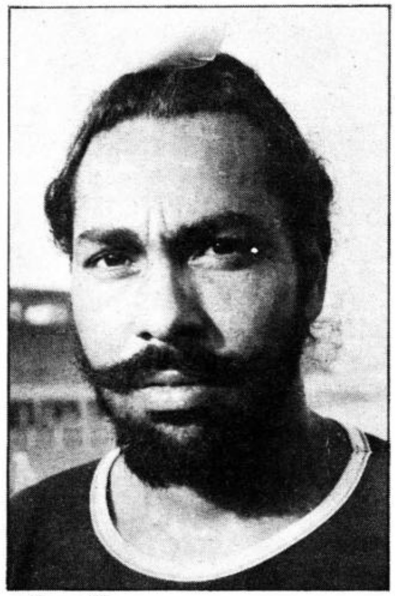

দেবিন্দর সিং

মহম্মদ শহিদ

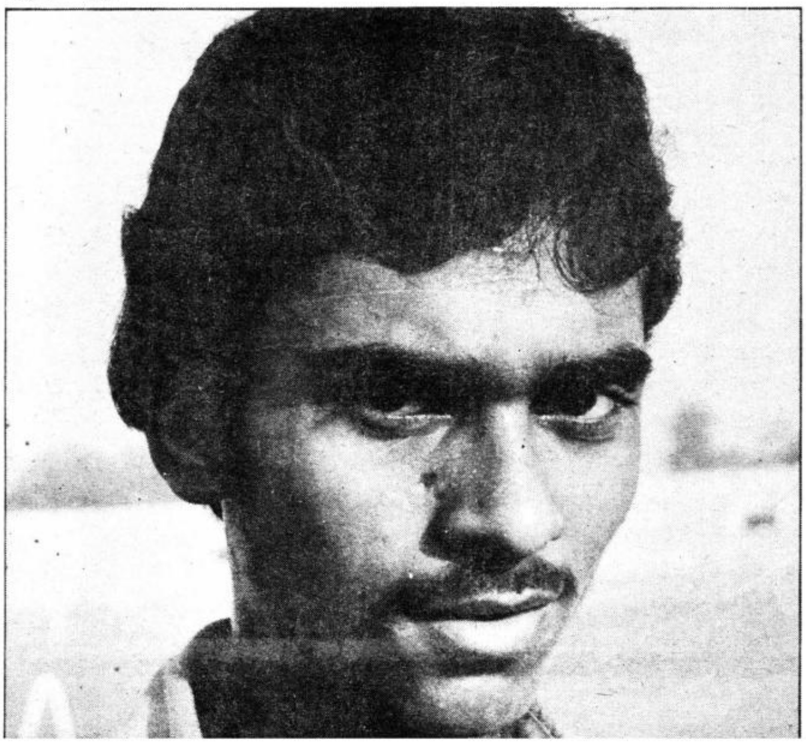

নতুন ভোর হ'ল নতুন রোদ উঠল

নতুন SUNLIGHT DETERGENT POWDER

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম। সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে। সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর ওর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে। আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন— মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়

মাত্র ৬ টাকা/৩৫ পয়সায়
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2569 Ben

দাপট দেখালেন বোলাররা

সুজয় সোম

কিরি টসে হেরে গেলেন। তবু দক্ষিণাঞ্চলকেই ব্যাট করতে পাঠালেন কীর্তি আজাদ। ভাবলেন, ফিরোজ শাহ্ কোটলা মাঠের পিচে ঘাস আছে। খেলার শুরুতেই ব্যাটসম্যানদের আতান্তরে ফেলা যাবে।

তাই-ই হল। চা-বিরতির আগেই ১৯২ রানে ইনিংস শেষ। নির্ধারিত সময়ে ৫·১ ওভার কম বল করায় পেনাল্টি হিসেবে আরও ২০ রান জোড়া লাগল। তিন খেলোয়াড় শূন্য রানের চশমা পরলেন। ১০ রানের নীচে আরও তিনজন। শিবরামকৃষ্ণন ২৬, আরসাদ আয়ুব ২০, আবদুল জব্বর ১৭, শিবলাল যাদব ১৫ এবং অতিরিক্ত ১৭। এই ঘটনার জন্য চারজন দায়ী। রাজিন্দার সিং ঘাই (২০-৪-৭২-৩), সুনীল ভালসন (১০-১-৪৭-২), অজয় ঝাঁ (১২-২-৪১-২), মনিন্দার সিং (৬·৫-১-২২-৩)। কিন্তু চার বাঘা বোলারকে তাচ্ছিল্য করে বুক চিতিয়ে লড়ে গেলেন ক্যাপ্টেনসায়েব। ৭৯ রানে ছয় উইকেট খুইয়ে দলের যখন কাঁদো-কাঁদো অবস্থা, আরসাদের সঙ্গে সপ্তম উইকেটে হুড়মুড় করে ৪৯ রান যোগাড় করলেন কিরমানি। অষ্টম জুটিতে শিবলালকে নিয়ে ৪৫ রান। একশো পঁয়ত্রিশ মিনিটে কিরির ৮২ রানের অমন সাহসী,. দুরন্ত ইনিংসের তুলনা হয় না!

প্রথম দিনের শেষে ৩—১০১ রানে প্যাভেলিয়নে ফিরলেন উত্তরাঞ্চলের খেলোয়াড়রা। চেতন চৌহান, নবজ্যোত সিধু, ভাস্কর পিল্লাইকে ফেরত পাঠালেন মিডিয়াম পেসার রঞ্জিত কালিনকর: ১৬-৩-৫২-৩। রঘুরাম ভ্যাটের বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে গেছিলেন গুরশরণ সিং। কিরি চটপট বেল তুলে নিতে পারলেন না। ফলে একশো তেরো মিনিট ক্রিজে থেকে একটা ছক্কা ও চারটে বাউণ্ডারিসুদ্ধ অপরাজিত ৫৫ রানের দাপট দেখালেন গুরশরণ। যশপাল শর্মাও নট আউট, ১৫ রানে।

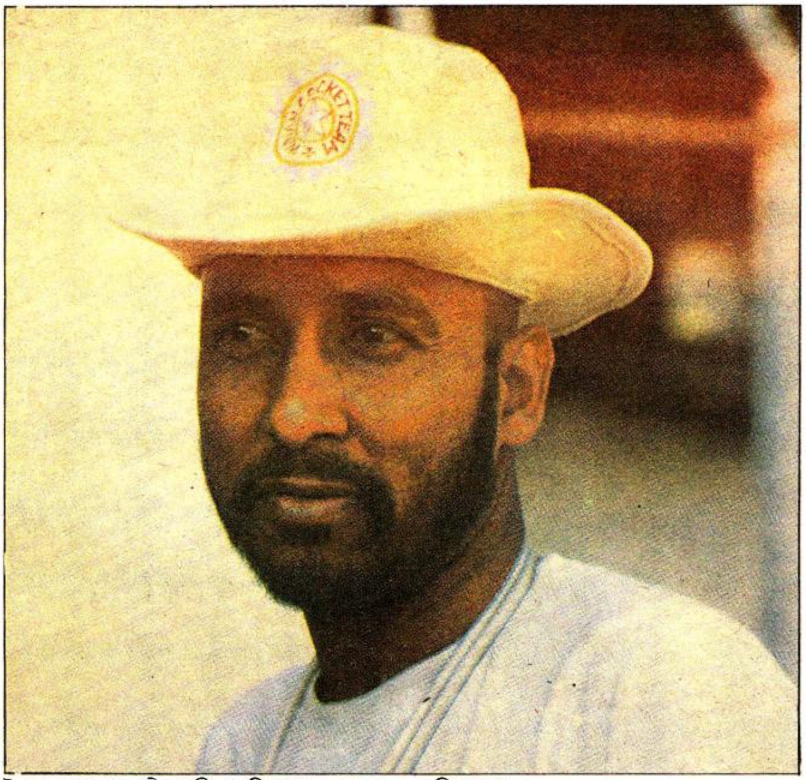

সৈয়দ হোসেন কিরমানি (দক্ষিণাঞ্চলেব সফল অধিনায়ক)

রবিবার, দ্বিতীয় দিনে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন টেস্ট-বাতিল বাঁ-হাতি স্পিনার রঘুরাম: ২২·৫-৮-৪২-৪! পঁচিশ ওভার পাঁচ বল খেলে লাঞ্চের আগেই আর মোটে ৫৯ রান জুড়ে বিদায় নিলেন বাকি সাত খেলোয়াড়। পেনাল্টি হিসেবে ৪ রান পাওয়া গেল। আগের দিনের সঙ্গে যশপাল ১৭ ও গুরশরণ ১৩ রান যোগ করলেন। আরও দুই তারকা ব্যাটসম্যান—সুরিন্দার খান্না ১২, কীর্তি আজাদের ৯ রান।

মন্থর পিচ। অসমান বাউনস। বল মাঝে-মাঝে গড়িয়ে গেল। কখনও-বা বিচ্ছিরিভাবে লাফিয়ে উঠল। ফলে ব্যাটসম্যানদের সুখে থাকা মুশকিল। স্ট্রোক করা বড্ড শক্ত। স্পিন বোলারদের পোয়াবারো। তাই ১৭৯ রান করার ফাঁকে দক্ষিণীদেরও সাত উইকেট খোয়া গেল। আবদুলের ৬৮ বা কিরির অপরাজিত ২৯ রান ছাপিয়ে বাঁ-হাতি মনিন্দারের মাপা ফ্লাইট আর স্পিনের রোমাঞ্চকর বোলিং: ২১-৫-৬৩-৪!

পরের দিন, এগারোই ফেব্রুয়ারি সকালে পঁয়ত্রিশ মিনিটে দক্ষিণাঞ্চল ১৭৯ থেকে ইনিংস টেনে নিয়ে গেল ২৩৬ রানে। দু-দিন মিলিয়ে ৫০ রানের তুবড়ি ছোটালেন সৈয়দ মুজতবা হোসেন কিরমানি। আরসাদ ৩০, শিবলাল ১৫। তিনজনকেই ঘায়েল করলেন মিডিয়াম পেসার অজয় ঝাঁ।

জিততে হলে দেড় দিনেরও বেশি সময়ে ২৮৫ রান করতে হবে। খানিক উঠে-পড়ে লেগেও ২০৭ রানের বেশি যোগাড় করা গেল না। ওপেনার সিধুর কাঁধে ব্যথা, ব্যাট করলেন না। সুরিন্দার ও চেতন ইনিংস শুরু করে ছত্রিশ মিনিটে ৩৬ রান তুললেন। লাঞ্চের পরই ভরাডুবি। ৭৬ রানে পাঁচ উইকেট পড়ার পর রাজিন্দার (৫৪) ও ভাস্কর (৪৭) মিলে দামি ৮৫ রান আদায় করলেও শেষরক্ষা হল না। মিডিয়াম পেসার অরুণের অ্যাভারেজ: ১৯·৫-২-৮৪-৫। চারদিনের ফাইনালের যুদ্ধ তৃতীয় দিনে চা-পর্বের পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে ফুরিয়ে গেল!

নয় বছর পর উনিশশো চুরাশি-পঁচাশি সালে ফের দলীপ ট্রফি জিতল দক্ষিণাঞ্চল। এগারোবার ফাইনালে উঠে এবার নিয়ে মোট সাতবার।

‘একদিন’-এর রাজা

সম্রাট রায়

এটা অনেক সময়েই দেখা গেছে অধিনায়কত্ব হাতে পেয়েই কেউ-কেউ বাক্যের ফুলঝুরি ছোটাতে শুরু করেন। প্রতিশ্রুতিগুলি হয় বেশির ভাগই বেশ লম্বা-চওড়া। প্রতিশ্রুতি নয়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে অধিনায়কত্বে অভিষিক্ত হবার পরে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালান বর্ডার শুধু বলেছিলেন, “ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারাবার কোনও গোপন ফর্মুলা নেই। জিততে হলে ভাল খেলতে হবে, ক্যাচ ধরতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, ওদের পেস বোলারদের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে ব্যাট করতে হবে।” বর্ডারের বক্তব্যে আর কিছু না থাক, আত্মসচেতনতার তাগিদ যে ছিল সেটা বোঝা গিয়েছিল চতুর্থ টেস্ট ড্র এবং পঞ্চম টেস্টে দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে দিতেই।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অবধ্য নয় এই সত্যিটা বোঝা গেল আরও একবার, যখন ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাপের তিনদফা ফাইনালের প্রথমটিতে মুখোমুখি হল দুই যুযুধান দেশ। মাত্র সাত রানে দুটি এবং চৌষট্টি রানে চার উইকেট পড়ে যাবার পরে উইকেটে আসেন বর্ডার। দৃষ্টান্তস্থাপনের ক্ষেত্র হিসেবে অধিনায়ক বর্ডার এই ভয়ঙ্কর সময়টিকেই বেছে নিলেন। এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান পেস বোলিংয়ের বিষাক্ত ছোবল নিঃশঙ্ক ব্যাটে প্রতিহত করে ১২৭ রানের অকুতোভয় ইনিংস খেললেন। ছিয়ানব্বইটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে এত বড় রানের ইনিংস আর কেউ খেলেননি। বর্ডারের চোখ-ধাঁধানো ১২৭ রান অস্ট্রেলিয়ানদের

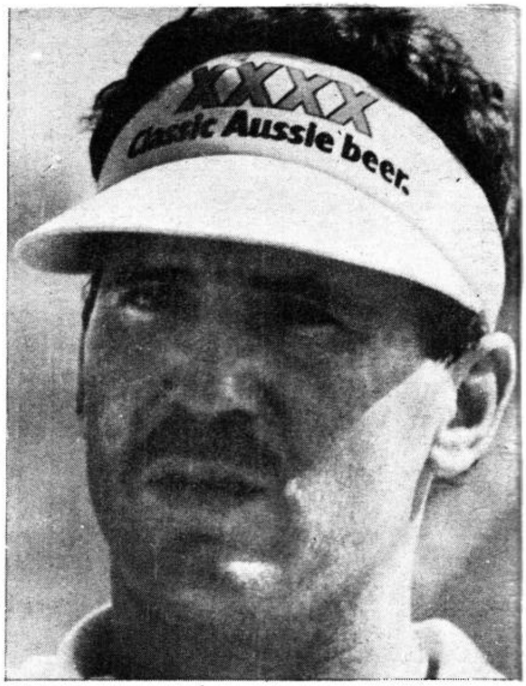

অ্যালান বর্ডার (অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক)

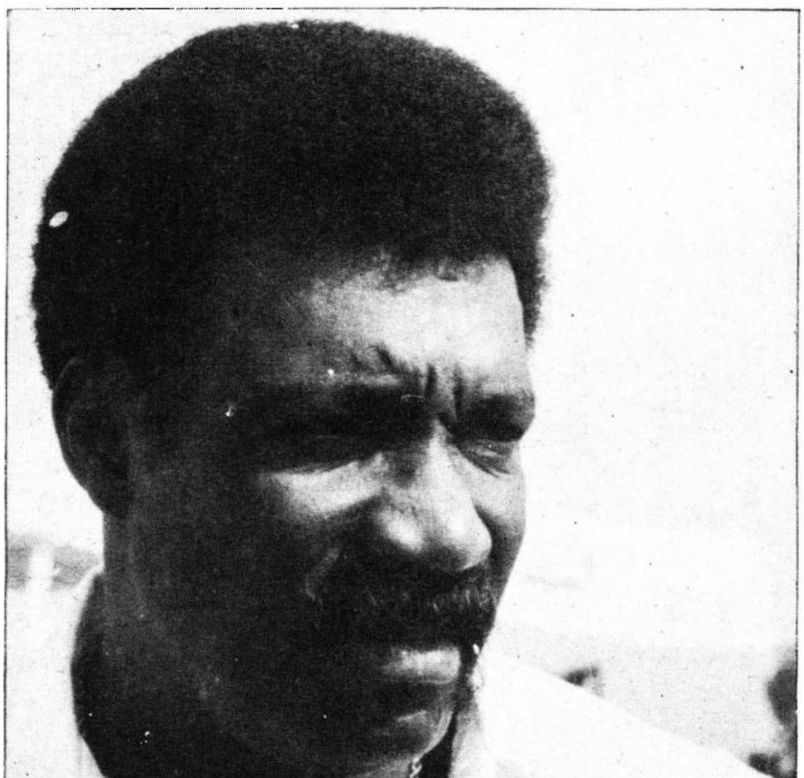

ক্লাইভ লয়েড (ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক)

এমনভাবে উজ্জীবিত করল যে, অস্ট্রেলিয়া পঞ্চাশ ওভারে পৌঁছল ছ’ উইকেটে ২৪৭ রানে। কিন্তু তার চেয়েও বড় ঘটনা—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অল আউট হয়ে গেল ৪৭·৩ ওভারে ২২১ রানে। অস্ট্রেলিয়া জিতল ২৬ রানে।

সিডনি থেকে মেলবোর্ন। দ্বিতীয় ম্যাচে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মরিয়া হয়ে উঠল জয়ের বাসনায়। অস্ট্রেলিয়া পঞ্চাশ ওভারে মাত্র তিন উইকেট হারিয়ে পৌঁছয় ২৭১ রানে। এই রানে জেতার স্বপ্ন দেখা যায়। কিন্তু এমন বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতেই সর্বোত্তম ক্রিকেট খেলল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। ম্যাচের শেষ ওভারে রডনি হগের বলে দুটি বাউণ্ডারি মেরে একটি অবিশ্বাস্য জয় ছিনিয়ে আনেন লোগি। রিচার্ডস এবং লয়েডের ব্যাটিং-ব্যর্থতা সত্ত্বেও রিচার্ডসন, লোগি এবং দুজোঁ ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ফিরিয়ে আনেন লড়াইয়ে।

১-১ অবস্থায় শেষ-যুদ্ধ শুরু হয় সিডনিতে। বলা বাহুল্য, মেলবোর্নে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ছিল মরিয়া, সিডনিতে রইল সতর্ক। অস্ট্রেলিয়াকে ১৭৮ রানে বেঁধে রাখার পরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাত্র তিন উইকেটেই পৌঁছে যায় জয়ের লক্ষ্যে। তিনদফা ফাইনালের প্রথমটিতে পিছিয়ে থেকেও পরের দুটি ম্যাচে জিতে বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস কাপ জিতল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। কারুরই আর বুঝতে বাকি থাকার কথা নয়, একদিনের ক্রিকেটে সত্যিকারের রাজা কারা।

প্রতিটি সুহৃইট খাসা দারুণ মজায় ঠাসা!
বড় আকার!
খেতেও বড় মজাদার!
নিউট্রিন
SuperStar
সেরা টফি চমৎকার
nutrine
SuperStar
DELITE
TWINTREAT
TOPCREAM
টুইন ট্রিট
ডিলাইট
টপ ক্রীম
স্বর্গীয় আনন্দ!
nutrine ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর স্যুইট
নিউট্রিন কন্‌ফেকশানারী কোং প্রাঃ লিঃ, চিত্তুর, অ.প্র.

ANANDAMELA 20 MARCH, 1985. Regd. No. WB/CC... -By-SOUTH 683TN/MS(C) 731

"মা, আমার খিদে পাচ্ছে..."

বাচ্চাদের সব সময়ই খিদে পায়—আর আশ্চর্য, তার কোনো সময় অসময় নেই। এবং কোনো মা-ই কি এই ছোট্ট সহজ কথাগুলোকে ফেলতে পারে? কিন্তু আপনিও তৈরী। কারণ সুস্বাদু পুষ্টিকর চমৎকার খাবার তৈরী করার জন্য আপনার হাতে আছে ম্যাগি। পাঁচটি চমৎকার ফ্লেবার– চিকেন, মসালা, ক্যাপসিকা, লাসানিয়া এবং সুইট সাওয়ার দিয়ে খাবার তৈরী করে দিন।

অবশ্য বাচ্চারা তো রকমারী খাবারেরই ভক্ত। আর ওদের জন্য নতুন নতুন খাসা রান্না করতে আপনারও ভাল লাগবে।

চিকেন নুডলস ইন ক্যাবেজ

উপকরণ

১ প্যাকেট চিকেন টেষ্টমেকার সহ ম্যাগি ২ মিনিট নুডলস
৫০ গ্রাম (১ কাপ) বাঁধাকপি, কুচি কুচি করে কেটে রাখ। ২টি শুকনো লঙ্কা কুচিয়ে,
বড় চামচের ১ চামচ তেল
১ ½ কাপ (২০০ মিলিলিটার) জল
৩-৪টি বাঁধাকপির আস্ত পাতা (রুচি মাফিক)

পদ্ধতি

কেটে রাখা বাঁধাকপি এবং শুকনো লঙ্কা ১ মিনিট তেলে ভাজুন
ঐ বাসনেই জল ফুটতে দিন। জল ফুটে গেলে টেষ্টমেকার এবং ম্যাগি ২ মিনিট নুডলস মেশান। ২ মিনিট ফুটতে দিন।
বাঁধাকপির আস্ত পাতা সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

বিনামূল্যে!

ম্যাগি
ব্যাঞ্জন পুস্তিকা
আপনার জন্য একটি পুস্তিকা পাঠাতে লিখুন
এই ঠিকানায়:
পোস্ট বক্স নং ৩৮৫৫
নিউ দিল্লী

MAGGI® 2-Minute noodles

রান্না হয় তাড়াতাড়ি! খেতে লাগে মজাদারী!